

# আমার আমি

হোসনে আরা ইদ্রিস

# আমার আমি

হোসনে আরা ইদ্রিস

মোসাফ সামসুজ্জোহর  
২১/১০, বাকর রোড  
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭



নাগরিক প্রকাশন



আমার আমি  
হোসনে আরা ইদ্রিস

স্বত্ব : লেখক

প্রকাশক : নাগরিক প্রকাশন  
সি-১১, বেইলী রিজ, নাটক সরণী  
১ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল : ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

প্রচ্ছদ : শেখ ফারুক আহমেদ

অঙ্কর বিন্যাস : অবেদ্যা কম্পিউটার্স

মুদ্রণ : অবেদ্যা কম্পিউটার্স  
৩২৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা  
ফোন: ৯৬৭৬৩২৫, ০১৭১২-১০৫৯৬৪

মূল্য : একশত বিশ টাকা

## উৎসর্গ

আমার মা  
শরিফুন্নেসা বেগম  
আমার আদরের মেয়ে ও নাতনী  
সুখী, সোমা ও সামায়েরা

## আমার আমি

হোসনে আরা ইদ্রিস

অনেক দিন ধরে আমার কিছু লিখব, বিভিন্ন স্মরণিকায় মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ লিখি, তাৎক্ষণিকভাবে লিখি।

কিন্তু এবার আমি আমার একটি ভিন্নভাবে, আমার কলেজ বন্ধু হাবিবা আটলান্টায় যাওয়া এবং আমার মাঝে মাঝে যাওয়া করে যাওয়া হয় না। ২০১৪ সনে আমার আরও কিছু লিখি। আমার আদরের ছোট বোন শাহিন যে নিউ ইয়র্কে আসবে এবং আমরা সকলে মিলে হাবিবার আটলান্টায় বেড়াতে গেলো। কলেজের সন্ধ্যায় সে একটা আত্মজীবনী-কর্মজীবনীমূলক বই লিখছে। সেটা লিখতে কিছু অংশ পড়ে শোনালো এবং আমাকে তোড়জোড় তানিদ দিন। আমি তেল অদৃশ্যই লিখি। হাবিবার লেকের পারে ছবির মত বাড়ী ভীষণ ভাল কাটল কয়েকটি দিন।

বাংলাদেশে এসে কাজের ব্যস্ততায় আজ নয় কাল করে আলসেমি করছিলাম। এর মধ্যে হাবিবা নাছোড়বান্দার মত ই-মেইল-এর মাধ্যমে তানিদ দিয়ে চলল। ওর লেখা বাকী অংশ ই-মেইল-এর মাধ্যমে পাঠাতে শুরু করল। তাই আজ ভালো আদর দেবী নয় শুরু করা যাক। আসলে যে কোন লেখা শুরু কি দিয়ে হবে এটা একটা কঠিন ব্যাপার।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম মানুষ কত কিছু নিয়ে লেখে আমি আমাকে নিয়েই লিখব। আমাকে আমি কিভাবে দেখছি কী ছিলাম সময়ের পরিবর্তনের সাথে, আমি সেই ১১ ভাই-বোন একদম পিলার হিসাবে অবস্থান নিয়ে অর্থাৎ বড় পাঁচজন এবং ছোট পাঁচজন মাঝখানে আমার অবস্থান। জন্ম ১৯৫৪ সনের ১লা জানুয়ারি।





আমার মা

কত মরুপথ পেরিয়ে আজ ২০১৫ জানুয়ারি লিখতে বসলাম। আমরা ছিলাম উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে। বর্তমানে উচ্চবিত্ত (লোকে বলে) কারণ ফরিদাবাদ গেভারিয়া থেকে বারিধারায় বসবাস করছি। মাঝে মধ্যে উদাস হয়ে ভাবি কতই না আনন্দের ছিল ছোট বেলা। কত অল্প জিনিসে আমরা খুশি হতাম। আনন্দ ছিল সকলে মিলে সব কিছু ভাগাভাগি করে খাওয়া একত্রে সকলে বেড়ান। একটি গাড়ী, একটা টিভি কত আনন্দ দিত। সপ্তাহে একটি নাটক দেখার জন্য কত অপেক্ষা-আনন্দ যাদের টিভি ছিল না। যারা থাকে কাছাকাছি তারা চলে আসত আমাদের বাসায়। এখন একটি বাসায় ২-৩-৪টি করে টিভি। কিন্তু কারোর সাথে কেহ-ই বসে দেখতে স্নাচ্ছন্দবোধ করে না। এক টেবিলে ১২-১৪ জন খেতে বসার আনন্দ কতটা ছিল এখন মনে হবে গল্প। এখন একত্রে খাওয়া প্রায় উঠে গেছে ভিন্ন জনের খাবার-কুচী আলাদা। সেই সময় খাওয়ার টেবিল ছিল গল্পে মুখের এখন শব্দবিহীন। বিশেষ করে যত ডিজিটাল উন্নত তা-ই মুখের কথা বন্ধ হয়ে হাতে মোবাইল এবং কম্পিউটারে নীরবে বোতাম চাপাচাপির হালকা শব্দ অলস, অসামাজিক হয়ে উঠছে বর্তমানের জেনারেশন বেশী প্রশ্ন করলে ভুরু কোচকায়ে অর্থাৎ বিরক্তি প্রকাশ।

মাঝে মধ্যে এখন পিছনের দিকে টানে, মনে হয় ইস। যদি আবার ছোট বেলায়, কিশোর ও তরুণ্যে ফিরে যেতে পারতাম, আমাদের সময় নিজ ভাইবোন চাচাত, খালাত, মামাত ও পাড়াগত বন্ধুত্ব ছিল এত গাড় ও গভীর যা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় ক্রমশ ফিকে হয়ে কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ-ই কারোর বাসায় যায় না এমন কি সন্তান মা-বাবার কাছে বা মা-বাবা সন্তানের কাছে না জানিয়ে ইচ্ছে হলেই যাবে না, বা দেখা হবে না। আমরা সকলেই নিজেদের গতি একটা বৃত্তাকার দিয়ে আবৃত করে রেখেছি।



আমার ঐকম সন্তান জন্মের একদিন পূর্বে মা ও মেজ বোন শেলী

ওরুতেই বলেছি (১১) ভাই-বোন সাথে আরও আত্মীয়-স্বজন, কত রকম সমস্যা নিয়ে তারা সমাধানে চলে আসত কোন আগাম বার্তা ছাড়া। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে প্রায় দেখতাম প্যাণ্ডেল ঘর সাজান বিয়ে হচ্ছে। অনেক সময় তাদের চিন্তাম না ততটা। কারণ আমার মা ছিলেন ভীষণ উদার প্রকৃত অর্থে আন্তরিক ভালবাসা সম্পন্ন মানুষ। কারোর কোন সমস্যা যতক্ষণ সমাধান না করতে পারতেন ততক্ষণ তার শান্তি নেই। তা বিয়ে হোক, চাকরি হোক, চিকিৎসা হোক কিংবা ঢাকা শহর ঘুরে দেখার জন্য হোক।





আমার নাম আমার আনন্দ

আমি কখনও আমাদের রান্না ঘরে নিশুপ দেখতাম না। বাবা ছিলেন খানেআলা ও খাওয়ানেওয়ালা। তেমনি ছুটির দিন বাজার করতেন ঝাঁকা বোঝাই। মাঝে মাঝে রান্না করার ইচ্ছায় আমাদের নিয়ে ছুটির দিন অনেক মজা করতো। শুক্রবার আসলে দ্বিদের দিনের আনন্দ উপভোগ করতাম। তবে বৃহস্পতি খুব কষ্ট ছিল। কারণ ঐ দিন ছিল চিরতা, হরতকি, বয়ড়া, নীমপাতা ভেজানো পানি সকালে খালি পেটে আর এর পর আরও দুঃখ নিরামিশ্র ভোজন।

ছুটির দিন আমাদের মাঝে মধ্যে বনভোজন লেগে থাকত। আমাদের বাসা অনেক বড় ছিল, গাছ-গাছালি ভরা চাল-ডাল যে যার বাসা থেকে নিয়ে গাছ তলায় ইট-চুলা লাকড়ি মানে গাছের ডাল জ্বালিয়ে রান্না হত। একবার একটা মজার কাণ্ড ঘটল। আমার অবস্থান ছিল ঠিক মাঝখানে অর্থাৎ  $5+1+5=11$  জন ৬ নম্বর সন্তান আমি। আমার বড় ভাই, ছোট ভাই ভাই তাই স্বাভাবিকভাবে আমি ওদের সব বিষয় অনুকরণ করতাম। পিকনিক হবে একদল রান্নার সাথে বাসার রান্নার বুয়া, আরেক দল বাজার করবে আমি এ বাজারের দলে গেলাম। আমার ভাই মুরগী কিনে আমার হাতে দিল ছুটে চলে না যায়, তাই জোড়ে গলা চেপে ধরে রাখলাম। বাসায় আসার পর বাবা বললেন দেখি কি কিনেছ-মুরগী উঁচুতে তুলে ধরতেই বাবা বললেন, এই কি হল মুরগী যে মরে গেছে অর্থাৎ আমাদের ছোট পেয়ে সম্ভবতঃ আধা মরা মুরগী দিয়েছে। আমরা হা করে রইলাম। পরে বাবা পিয়ন পাঠিয়ে বদলে এনে দিলেছিল।

আমি ভাইদের সাথে ডাংগুলি, মার্বেল খেলা, গাছে উঠা স্বাচ্ছন্দবোধ করতাম। প্যান্ট ভাইদের মতন পকেটওয়ালা নিতাম সুবিধা পকেটে মুড়লী, বাদাম ও বুট ভাজা রাখতে পারতাম।

দুপুর বেলা ছুটির দিনে ঘুমাতে হবে এটা ছিল কড়া আইন। তারপূর্বে

ছিল মজার একটা রুটিন আমাদের সকলকে একজন-একজন করে ৫ মিঃ বাবাকে হাত পাকা দিয়ে বাতাস করতে হবে। কিন্তু যখন ঘুমাতে

যাব তখন আসত আচারওয়ালা। আইসক্রিম, হাওয়াই মিঠা, কটকটিওয়ালা। তখন একমাত্র মেজ ভাই আমাদের সাহায্য করত। কারণ সে ভাইদের মধ্যে প্রাণবন্ত আনন্দ-খুশীর প্রতিক। এমন কি রাতে তখন হিন্দু ধর্মের চৈত্র সংক্রান্তি শিব-পৌরির নাচ হত, তা দেখার জন্য মেজ ভাই চুপি-চুপি আমাদের নিয়ে ছাদে অথবা গেটের কাছে দেখাত। বকা-ঝকা খেলে এটা সেটা কিনে দিত কিংবা বেড়াতে নিয়ে যেত।

মজার একটা ঘটনা না বললে নয়। আমরা মেট্রিক পরীক্ষার টেস্ট পরীক্ষার পর ৭/৮দিন ছুটি। সব বন্ধু মিলে ঠিক করলাম আমরা বন্ধুরা মিলে



আমার স্বামী ইন্দিরা ও আমি



আমি আমার দু কন্যা

সিনেমা দেখব বড় ভাই কেহ থাকবেনা। কারণ সব সময় বড় ছাড়া কোথায় যাওয়া যেত না। আমার খালাত বোন রেবু আমাদের বাসায় থেকে পড়াশুনা করত আর মেজ ভাই এর সাথে প্রেম করত। কত চিঠি আর পাহারাদারের কাজ করতে হত। রেবুকেও নিলাম। ইন্টারভেলের সময় পিছনে তাকিয়ে দেখি মেজ ভাই তার দলবল নিয়ে ঠিক পাহারা দিতে এসেছে। বুঝতে পারলাম এটা বের ছাড়া কারোর কাজ নয়। যা হোক মেজ ভাইকে খশালাম আমাদের খাওয়াতে হল, মজাই হল।

ছোট বেলার মজার ঘটনা এত মুধুর ছিল বিশেষ করে মেজ ভাই যে



অনেক কম বয়সে আমাদের ছেড়ে অজানার দেশে চলে গেছে। আমরা ১১ ভাই-বোন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেবী ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া ছিল আমাদের বাসায়। সকাল থেকে দুপুর বিকাল পর্যন্ত স্কুলে যাওয়া-আসা ছিল। একটা বুয়া শুধু ডিম পোচ, অমলেট, সিদ্ধ বিভিন্ন প্রকার মুরগী, মাংস, সজবী বুয়া শুধু ডিম পোচ, অমলেট, সিদ্ধ বিভিন্ন প্রকার মুরগী, মাংস, সজবী বানাতেই থাকত। দেখতে দেখতে আমার কলেজে ভর্তি পাল। আমি গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগে ছিলাম। হায়ার সেকেন্ড ডিভিশন পেলাম। ঐ বিষয় একটা কলেজ ছিল নিউ মার্কেটে ইডেন কলেজের পাশে। আমার মেজ বোন তখন ডাক্তারী পড়ত, ওর স্বামীও ডাক্তারী পড়তেন। তাঁর নাম দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী। ডাক নাম মনু ভাই। আমাদের খুব পছন্দ ছিল তাকে। তিনি বললেন, ওনার কাজিন দুলু আপা পড়েন ঐ কলেজে। ভাই মা বললেন, মনু তুমিই ভর্তি করে দাও। গুরু হল কলেজ জীবন। সাত সকালে কলেজের গাড়ী আসলে আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে যেত। আয়া এত ভাল ছিল প্রতিদিন খাবার গুছিয়ে নিয়ে আসত আর যখন ক্ষুধা লাগত তখন দিয়ে যেত। আমরা একই ক্লাসে স্কুল বন্ধ ৬ জন এক কলেজে ভর্তি হই। এবং এক সাথে আসা-যাওয়া করতাম। সে যে কি মজা তা বলে বুঝতে যাবে না। আমরা স্কুলে এই দল বেশ ভাল দুই ছিলাম। যা মানা ছিল করতাম হেড মিস্ট্রেস ছিলেন বাসন্তী গুহ। ঠাকুরতা ওনার স্বামী ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্যোতিরময় গুহ। এত জ্ঞানী এবং মর্যাদা সব বছরে একবার লন্ডনে ঘুরতে যেতেন। '৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধে তাকে ফেলে ঘাতক দালালরা।

যাক, যা বলছিলাম আমাদের নামে নালিশ যেতেই থাকত। খুব সুন্দর বাগান করাতেন আমাদের ছাত্রীদের হাতে। আমাদের স্কুলের নাম ছিল মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয় গেভারিয়ায় আমাদের দুইমুণ্ডলি এমন ছিল-গাছে লেখা থাকত প্রাক মি নট আমরা টাচ করতাম আর সেটার মধ্যে লেখা থাকত টাচ মি না সেটা প্রাক করতাম। প্রাকটিক্যাল ক্লাসে যেতে হত স্টোর রুম পার হয়ে সেখানে আগামীকালের টিফিনের জন্য কলার ছড়া বুলিয়ে রাখত দরকার না হলেও তা ছিড়ে রেখে আসতাম। এমন কি আয়া-বুয়াদের পান-সুপারি বাদ যেত না। বাসন্তী দি কি করবেন কত শাস্তি দিবেন তার রুমে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। একটা সুবিধা পেতাম আমরা সবাই পড়াশুনায় ভাল থাকায় এবং হোম টাঙ্গ করতাম, ক্লাস ক্যান্টেন সব আমরাই হতাম। মজার ঘটনা ক্লাস ক্যান্টেন ছাত্রীর উপস্থিতি সংখ্যা লিখে দেওয়ার নিয়ম টিফিনের জন্য। আমরা সব সময় ৫-৭ টা বেশী দিতাম

কারণ আমাদের দিতাম নিজের লিডারশীপ রাখার জন্য। যাদের দিয়ে টুকটাক কাজ করাতাম তাদের দিতাম নিজেরা অনেক সময় খেতাম না। তাই নালিশ বেশি স্থায়ী হত না। আমাদের বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে ইংরেজি টিচার কে আমরা আড়ালে “বাঘ ডাকতাম”। কারণ পড়া পারলেও বকা না পারলেও বকা এমন কি ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফেয়ারওয়েলের দিনও তিনি বললেন, “যা যা তোদের মুখ যেন আর না দেখি”। সালাম করার পর সব শিক্ষক কত দোয়া-তাদের আর উনি এই কথা বলায় আমাদের মন ভীষণ খারাপ হল। রেজাল্টের পর সকলে যখন সব টিচারের সাথে দেখা করতে গেলাম তখন তিনি কি বললেন জান? বললেন তোদের মন খারাপ হয়েছে আমার কথায় কিন্তু কেন বলেছি জানিস, মুখ দেখতে চাইলে সব



আমার দুই কন্যা

ইংরেজিতে ফেল করে আমাকে মুখ দেখাতে আসতি। আমরা হতবাক। ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ভাষা কত প্রকার সকলে লজ্জায় অবনত মুখে বললাম প্রথমে বুঝিনি। আর একটি ঘটনা আমার মনের কোণায় এখন উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমি ১ম-২য় শ্রেণি পড়িনি একবারে ৩য় শ্রেণিতে ফরিদাবাদ স্কুল, আমাদের বাসার একেবারেই কাছে। সেখানে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। ফরিদাবাদ স্কুল-এর সামনে দিয়ে রোজ



আমরা দল বেঁধে আয়ার সাথে হেঁটে স্কুলে যেতাম। একদিন তখন নবম শ্রেণিতে পড়ি। স্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ হেড স্যারের কণ্ঠ। ঐ হোসনে আরা দাঁড়া। দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং তিনি হাতে করে কয়েকটা প্যাকেট নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, “আজকে থেকে স্কুলে টিফিন দেওয়া হচ্ছে। তোদের সময় টিফিন ছিল না। তোদের রেখে কেমন করে খাই” লিখতে বসে এখনও চোখে পানি এসে যায় ভালবাসা কত রকম আবেগ-উচ্ছাস। তখন ছাত্র-শিক্ষক কত মধুর সম্পর্ক ছিল। পাড়াগত চাচা-মামা কত অভিভাবকদের আমরা শ্রদ্ধা করতাম। তাঁরাও ভালবাসতেন। প্রয়োজনে শাসন করতেন এতে কারোর বাবা-মা কিছু মনে করতেন না। তাই সামাজিক অবক্ষয় প্রায় ছিল না। বড়রা চাঁদা তুলে পাড়াগত অনুষ্ঠান-পাঠাগার করতেন সকলে মিলেমিশে একে অন্যের সুখ-দুঃখের একাকার হয়ে যেত।



আমার দুই কন্যা-সুখী ও সোমা

আমার মনে পড়ে তখন সম্ভবতঃ অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের গলিতে একটি বাসায় আঙন লেগে ২টি শিশু পুড়ে মারা গিয়েছিল। সে দিন দুঃখে-কষ্টে পুরো পাড়ায় কারোর বাড়িতে রান্না হয়নি। আন্তরীকতা এমন একটা জিনিস ছিল পাড়ায় ছুটির দিন যে বাসায় খেলা হত সে বাসায়

সকলে খেত এতে কোন দাওয়াত লাগত না।

যখন আমি ৮ম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমাদের বাসার একটা বাসার পরের বাসায় রত্না নামে (শাবানা) মেয়ে ওর বাবা-মা-ভাই-বোনসহ



আমার ছোট মেয়ে সোমা

উপস্থিত আসল। আসলে আমাদের পাড়ায় বেশীর ভাগ বাসা ছিল নিজেদের এই ভাড়াটিয়া কথা আমরা জানতাম না। আমাদের স্কুলে ভর্তি হল। পরিচয় হবার পরও জানাল ওরা ভাড়াটিয়া। কিছুদিন পর জানতে পারলাম ‘চকোরি’ নামে সিনেমার নায়িকা শাবানা ও নাদিম নায়ক। ওদের বিবাহিত অবস্থা তখন তেমন ভাল ছিল না। তাই স্যুটিং এর জন্য আমাদের বাড়ি থেকে অন্য দু’একটা বাসা থেকে নিয়ে স্যুটিং করত। আমাদের কি কোনো হত ওর স্যুটিং এর গল্প শোনার। কিন্তু মা এটা বেশী পছন্দ করতেন না। কিছুদিন পরও যখন নায়িকা হিসাবে খুব নাম করল অন্যত্র চলে গেল। বহুদিন পর দেখা হয়েছিল তা পরে বলব।

কৈশর পেরিয়ে তারুণ্যের আগমনে কম-বেশী আমার বান্ধবীরা আমরা সব সময় উচ্ছাসিত থাকতাম। ছোট-খাট প্রেমের আহ্বান একজন আরেকজনের সাথে মজা করে বলতাম। তখন বেশীর ভাগ প্রেম হত কাজিনদের মধ্যে অথবা ভাই-এর বন্ধুদের সাথে। কারণ এখনকার মত এত



ত্রি মেলামেশার সুযোগ ছিল না। আগেই বলেছিলাম আমার খালাত বোন রেবু তখন আমার মেজ ভাই-এর সাথে চুটিয়ে প্রেম করে। পাহারাদার-পিয়ন সব কাজ করতে হত। আমার সে রকম দু'চারটা ডাক আসতে থাকল। কিন্তু আমার এ ব্যাপারে সাহস টা একটু কম ছিল। কারণ ওদের যখন বকাঝকা খেতে দেখতাম তখন আমি সাহস পেতাম না। আমি খুব টাচি ছিলাম তাই ঐ সব সহ্য করতে পারব না ভেবে একটু বুঝে না বুঝার ভান দেখাতাম। তার পরেও খুচরো প্রেম হয়েই যায়। দেখতে দেখতে কলেজ ছাত্রী হলাম। একটু স্বাধীনতা কিন্তু কলেজ গাড়ী-বাসা এই নিয়ম গেটে কড়া পাহারা। আমাদের হোম ইকোনোমিক্স কলেজ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন “হামিদা আপা” ভীষণ রাস ভাড়ী-লোক আবার নিঃসন্তান। ভীষণ ভয় পেতাম। তিনি ঠিক দুপুর ১ টায় খেতে যেতেন বাসায় কলেজ গ্রাউন্ডে। আমরা সেই সময়টার অপেক্ষায় থাকতাম আচারওয়ালার সে গেটে অপেক্ষা করতে।



আমার স্বামী ও বন্ধু মিভা ও মাসুদ ইব্রিস

আপা যাওয়ার সাথে সাথে গেটের পকেট থেকে আমরা আচার কিনতাম। আপার বারণ এ সব খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি। ক্যান্টিন ছিল খুব মজার সিঙ্গারা ও বিড়িয়ানী পড়াটাও হত। আগেই বলেছি আমার দলটা একটু বড় ও দুট ছিলাম। সিঙ্গারা দুই দিক থেকে ফুটা কার সিরকা ঢালতাম

বেশীর ভাগ পড়ে নষ্ট হত আর বলতাম সিরকা দেন। ক্যান্টিনের ম্যানেজার কিছুদিনের মধ্যে আমাদের চিনে ফেলল। আমরা আসার সময় দূর থেকে দেখে সস-সিরকা সরিয়ে ছোট ছোট শিশি দিত। এখন ভাবলে খুব খারাপ লাগে লোকটার লোকসান হত কিন্তু তখন ভাবতাম মজা করছি। সময়ের ব্যবধানে মানুষের আচার-আচরণ-চিন্তা সব কিছু বদলে যায়।



কক্স বাজারে আমরা দুজন সূর্যাস্ত উপভোগ করছি

আমাদের বড় ভাই ছিল ভীষণ গম্ভীর। আর বড় বোন অনেক ছোট বেলায় বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তাকে কম পেতাম। ঈদ আসলে অপেক্ষায় থাকতাম কখন নতুন জামা আপা দিবে। আপার সন্তান ৫টি তা আমার বড় ভাইবোনের কাছাকাছি বয়স। ছোট-বড় ৮ম সন্তান মিহির আপার প্রথম সন্তান জাকির ৬/৭ মাস বড় এইভাবে জন্ম তালিকা ছিল। আপার বিয়ের সময় আমি ও রেবু খুব ছোট ছিলাম। সেমিজ প্যান্ট পড়ে আপার বিয়ের বিদায়ক্ষেণে সকলে ব্যস্ত। আমরা গাড়ীর সিটের নিচে বসে লুকিয়ে থাকলাম। উদ্দেশ্য আপার সাথে যাব। আপা দুলা ভাই গাড়ীতে উঠে বুঝতে পারলেন ইশারায় একজনকে বলে দিল। যাই হোক সাথে গেলাম কিন্তু তাদের বাসর রাতের বারটা বাজালাম। গিয়েই কান্না মার কাছে যাব। তেঁজগায় দুলা ভাই-এর বাসা। তা' আবার রাত। কি করবে



তার দুলা ভাই রেবুকে কোলে নিয়ে আর আমাকে দুলা ভাই কোলে নিয়ে সারা রাত হেঁটে কাটাল। এখন ভাবলে ভীষণ লজ্জা লাগে। দাদা ডাক্তার আমাদের বড় ভাইকে ভীষণ ভয় পেতাম। কিন্তু ভীষণ কেয়ারী ছিলেন।



আমার ভায়া ও ছোট বোন-এর স্বামী

পূর্বেই বলেছিলাম মেজ ভাই ছিলেন খুব চঞ্চল, হকি, ফুটবল খেলতেন। প্রায় চোট লাগিয়ে না হয় পায়ে ব্যথা পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতেন। আমাদের যত মন খুলে গল্প মেজ ভাই এর সাথেই হত। টেবিলে বসে পা ঝুলিয়ে বসা আমরা খুব পছন্দ করতাম। একদিন দাদাকে দেখে সেখানে বসে আমরা তাড়াতাড়ি চলে গেলাম না। দাদা দেখে নাই। দাদা দাঁড়িয়ে বললেন, কি দেখিনি নামা-না উঠে বসা। অর্থাৎ দু'টোই দেখেছেন

চশমার ফাঁক দিয়ে। আমরা খুব মজা পেতাম। কখন সরাসরি বকতেন না। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে বকতেন। উচিৎ আর কি করা উচিৎ নয়। 'সিএসপি' অফিসার ছিলেন তিনি। দাদা 'ডিআই'টিতে চাকরী করতেন। দাদার বড় একটা জীপগাড়ি ছিল। আমরা প্রতিদিন একটু হলেও গাড়ীতে ঘুরতে যেতাম। কি যে আনন্দ ছিল সেইদিনগুলি। দুলা ভাই জীপ নিয়ে আসত। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। আমরা গাড়ী বোঝাই করে চলে আসতাম তার কুমিল্লার বাসায়।

কলেজ পড়া অবস্থায় প্রথম একটা কষ্টের ধাক্কা খেলাম। ২৩ জানুয়ারি ঈদের দিন ছিল, সেদিন আমরা বাবাকে হারালাম। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকায় বাবা আগেই অবসর নিয়ে ছিলেন। মেজ বোন, শেলী আপা-ডাক্তারী পড়ত ও বাবার অবস্থা কিছুটা আন্দাজ করে পাশেই বসেছিল। আমার বাবা প্রথমে ডাক্তারী পড়তেন কিন্তু পুলিশ সার্ভিসে গিয়েছিলেন পারিবারিক কারণে। মা গল্প বলতেন, আসামীর শান্তি বাবা দেখতে পারতেন না। আবার তার পরিবারকে বাসায় পাঠিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আর্থিক সাহায্য করতেন। আগেই বলেছি বাবা ছিলেন খুব খানেওয়ালা। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকও ভীষণ খেতে পছন্দ করতেন। বাবাকে

খুব ভালবাসতেন। ট্যুরে গেলে বাবার কর্মস্থলে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

আমি ছোট বেলা অর্থাৎ ৪র্থ ক্লাস থেকে রেডক্রস টিকিট বিক্রি করার জন্য বড়দের সাথে যেতাম। একদিন হাট খোলায় রোজ গার্ডেন নামক বিরাট বাড়ীর গেট খোলা দেখে বাসার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি বিশাল এক ইজি চেয়ারে বিরাট আকারের একজন মানুষ, ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তিনি হাত দিয়ে ডাকলেন একটু একটু করে সামনে গিয়ে ওনাকে ব্যাজ পড়লাম। আমার মনে আছে তিনি ১০০ টাকা দিলেন আর আমাদের অনেক মজার মজার জিনিস খাওয়ালেন। আমরা ভীষণ খুশী। বাসায় এসে সকলকে গল্প করছি শুনে বাবা বললেন, আরে ওনিই তো শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। আমরা তখন ওনার জীবনী বইতে না আসায় ওনি কত আমাদের মানুষ আন্দাজ করতে পারিনি। তার কয়েকদিন পর ওনি মারা গেলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল একবার দেখা করার তা আর হয়ে উঠে নি।

বাবা যখন মারা যান তখন শুধু বড় আপার বিয়ে হয়েছে। আর মটু খুব পছন্দ থাকায় শেলী আপার আখত করিয়ে রাখলেন। দাদা কয়েকদিন সিএসপি ট্রেনিং পাকিস্তানে। এ ছাড়া আমরা সব স্কুল-কলেজ, কলেজ সিস্টেম লাইন দিয়ে পড়ছি। শেষের ৩টি বেশী ছোট তার মধ্যে তুরান



মেজ ভাই মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে কলকাতায়





দুই কন্যা-সোমা-সুখী

করলেন। ভাবীর দেশ সিলেট। দু'ভাই এক বোন। আমাদের মাঝে এসে এত মানুষ দেখে খেই হারিয়ে ফেলতেন, পরে অবশ্য মায়ে নিলেন। দাদার বিয়ের পর সেজ ভাই জাহাঙ্গীর দাদার বিয়ে হল। হঠাৎ করে খালাত বোন লিনুর সাথে। হঠাৎ হওয়ার কারণ লন্ডন পড়তে যাওয়াদেরও প্রেম ছিল। সুতরাং হারাতে না হয় তাই বাটপট বিয়ে।

আমি এক মাস অভিজ্ঞতা অর্জনে রেজিনা আমার বন্ধুর সাথে রুমমেট হয়ে ছাত্রী নিবাসে চলে এসেছিলাম। বিয়ের কথা শুনে অবাক! যা হোক খুব স্বপ্ন আয়োজনে বিয়ে হয়ে গেল।

মেজ ভাই এর বিয়ে আমার খালাত বোন ও ভাইয়ার প্রেমিকা রেবুর সাথেই হল। বিয়ের পর খুব আনন্দেই ছিল সকলে। কিন্তু হঠাৎ ওদের প্রথম সন্তান জন্মের কিছুদিন পরে মারা গেল। আমাদের বাসায় দুঃখের অন্ধকার নেমে আসল। মেজ দা আর্টিকেলশীপ নিয়ে লন্ডন চলে গেলেন। কিছুদিন পর ভাবী চলে গেলেন। মেজ আপার স্বামী মনু ভাই সবচেয়ে প্রথম লন্ডন গেলেন FRCS পড়তে। তার পর মেজ ভাই-এর পর মেজ আপা শেষে গেল সেজ ভাই। জাহাঙ্গীর দা। তিনটি পরিবার চলে গেল সদূর লন্ডন প্রবাসী হয়ে গেল।

যথারীতি পড়াশুনা করছি হাসি-কান্না মিলে ভালই ছিলাম সকলে। রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হল ১৯৬৯ সনে অসহযোগ আন্দোলন উত্তাল

ছিল একেবারে অবোধ। তাই ওর নাম রেখেছিলাম আমরা 'গুরু'। সবার বড়, ভাববে এবং ভাল লাগবে। যা বলছিলাম, বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা পূর্ব-পাকিস্তানে বদলী হয়ে দূতাবাসের পদ না নিয়ে শুধু আমাদের জন্য সব সুবিধা বঞ্চিত করে চলে আসলেন আমাদের কাছে। দাদার আমাদের প্রতি কর্তব্যের ঋণ শোধ কোনদিন হবে না। দাদা বিয়ে করলেন, মেজ ভাই-এর বিয়ের পর। পরে মা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পরের বছর বিয়ে ঠিক



উদয়া লেডিস ক্লাবের কমিটির সাথে আমি

আমাদের বাসায় লাল-সবুজ মানচিত্রসহ পতাকা উড়িয়ে ছিলাম ২৫ দিনের বেলায়। কারণ আমার চাচাত ভাই আব্দুল মান্নান যিনি এমপি এবং শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও লাল বাহিনীর প্রধান ছিলেন। আমরা তাকে "ভাই ডি" বলে ডাকতাম। মা-বাবার বিয়ের পর তিনি আমাদের সাথে থাকতেন। আমাদের বুদ্ধি হওয়ার পর তাকে দেখতাম আর ভাবতাম শক্তির পতিক এই ভাই ডি। আমাদের ভীষণ ভালবাসতেন তিনি। বাবা ঘুমিয়ে পড়লে মিষ্টি নিয়ে আমাদের ডেকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে অদ্ভুত গল্প বলতেন, গান করতেন-করারে লৌহ কপাট, শীকল পড়ার ছল। এই সব মুজিকামী গান। আমরাও জেগে অপেক্ষা করতাম। মা-কে ভীষণ সম্মান করতেন এবং বলতেন-আমার মা মরে গেলে কষ্ট হবে। কিন্তু এই চাচী



মারা গেলে আমি বাঁচব না। সে কথা আল্লাহ শুনেছিলেন। মার মৃত্যুর পূর্বে ভাই ডি সন্তান ও বিধবা স্ত্রী রেখে চলেন গেলেন এই পৃথিবী ছেড়ে।



আমাদের শ্রুতিবহুল ১৯/৩ ফরিদাবাদ বাবার বাড়ী

সেজ ভাই সব সময় চুপ-চাপ। নাম জাহাঙ্গীর। বিয়ে করে লন্ডন চলে গেল স্বাধীনতার পর। ২৫ মার্চ, ১৯৭১-এ আমাদের জীবনের ধারা বদলে দিল। সারা রাত গুলির আওয়াজ। মনে হচ্ছিল বিজলী-তান্ডব হচ্ছিল। আসলে গোলা-গুলি বর্ষণ হচ্ছিল। সকালে আমাদের বাসায় সামরিক বাহিনীরা আক্রমণ করল। গেটে স্বাধীনতার পতাকা। মা বললেন, পতাকা নামাও। পতাকা নামানোর আধা ঘণ্টার মধ্যে একদল স্ব-সজ্জিত সামরিক অস্ত্রসহ আমাদের বাসায় গোলাগুলি শুরু করল। সেকি বিকট শব্দ। ঘ্রোনেট মেয়ে ছিল পরে বারান্দায় বড় গর্ত দেখেছিলাম। গুলির আওয়াজ কানের পর্দা ফাঁটার মত। অনেক আগে ১৯৬৫ সনে ইন্দোপাক যুদ্ধের সময় বাবা বলেছিলেন কখনও গোলা-গুলি হলে দোতালায় ছাদের সিঁড়িতে বসে থাকতে। বলেছিলেন সিঁড়ির দু'পাশের দেওয়াল অনেক মোটা ছিল। গুলি দুই রুম আলমারি ভেদ করে দুর্বল হয়ে দেওয়াল ফুটা করতে না পেরে নীচে পড়ে যায় এবং আমরা সকলে সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাই। নানুকে নিয়ে একটু সমস্যা পড়েছিলাম এবং তিনি ভয়ে চিৎকার করছিলেন। যা

আমার আমি / ২২

হোক সকলে নীচে নেমে আসলাম। ভয়ে প্রায় সকলে বিপর্যস্ত, দলের মধ্যে সে ক্যাপ্টেন ছিল তার নাম "সালেহ"। আল্লাহ মার দোয়া কবুল করেছিলেন। নইলে হিংস্র জন্তুর মত দলের মধ্যে একটা ভাল মানুষ থাকার কথা নয়। সে বলল, আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা মুসলমান আপনাদের ভাই। ভয় একটু কমল। কিন্তু শান্তি পাচ্ছিলাম না। এর পর বলল, মান্নান কোথায়? আমি সাহস করে বললাম জানি না, কারণ ও তো আমার আপন ভাই না। হঠাৎ হঠাৎ আসে আমাদের বাসায়। দু'টো বাসার পর আমার খালার বাসা সেই বাসার উপর তলায় থাকে। আল্লাহর রহমত ওরা বিশ্বাস করল যদিও ভাই ডি পূর্বে বলেছিলাম রোজ রাতে একবার আসত এরপর ওরা ঐ বাসায় গেল। সাথে পাড়ার একটু মুখ চেঁনা বিহারী ছিল। ঐ মনে হয় পথ প্রদর্শক। কারণ তিনটা বাসা ছিল আমার বাবা ছিলেন আরেকজন বাদশালী দু'জন পুলিশ অফিসার ছিলেন। অন্যজন ছিল অবাদশালী পুলিশ সার্জেন্ট। তারা বাসা ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গেলেন মিরপুর চলে গিয়েছিল। সেই বাসায় হয়ত ঐ লোকটাকে দেখেছিলাম। আমি তখন কলেজে পড়ি। সুতরাং স্পষ্ট সব মনে আছে। সালেহ সালেহ আমার ছোট ভাই।

আমাদের বাসায়মান কবীর (নেহাল) কে ধরে নিয়ে গেল এবং খালার বড় ছেলে আলমগীর দাদা কে নিয়ে গেল। এতক্ষণ পরে আমার সাহস ফিরে আসল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? উত্তরে বলল, প্রেসিডেন্ট হাউজ আর আমাদের বলল, আন্দার মে যাও। বলল, আমার উপর হুকুম আছে মেয়েদের মেয়ে ফেলতে এবং ছেলেকে ধরে নিতে। সকলে মিলে কান্নার রোল কি করব কিছু বুঝতে পারছি না। আমার মা ভীষণ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস রাখতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর এক হাতে এত বড় ১১ সন্তানের ভার বহন করে চলছিলেন। মা আমার হাতে একটা ব্যাগে কিছু টাকা, সোনার জিনিস খুব ছিল না তাই এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজ দিয়ে পাশের বাসা বাবুল ভাইদের বাসায় যেতে বললেন। আমি আমার ছোট বোন মিরানকে নিয়ে সেই বাসায় গেলাম একটা বাসার পর। রাত্তায় দেখলাম ২/৩ জন লোক পানি পানি করছে গুলি খেয়ে শুয়ে আছে। আমি হতবাক কোন রকমে দৌড়ে বাবুল ভাই এর বাসায় উঠলাম।

সারারাত কিভাবে কাটল তা বলে বুঝান যাবে না। বাবুল ভাই বৌ-বোন আর আমরা মিলে ৭/৮ জন মেয়ে বিভিন্ন বয়সের। তার যে কি দুঃশিক্ষা বার বার ছাদে উঠে বাইনু কুলার দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন।

আমার আমি / ২৩



কারণ আমাদের বাসায় যখন আক্রমণ করেছিল তখন ওনারা জানালা দিয়ে পুরো দৃশ্য দেখেছিলেন।



জন্টা ঢাকা-০১ ক্লাবের বর্তমান পূর্ণঙ্গ কমিটির সাথে আমি

পরের দিন আমার খালাত বোন লিনুকে উল্টোদিকের বাসা থেকে ডেকে আমাদের সাথে নিয়ে নিলাম। ২৮ তারিখ কিছুক্ষণের জন্য কার্ফি বিরাম হল। খালুজান বললেন, অন্যত্র চলে যাবেন। এ দিকে বাবুল ভাইদের দেশ চুনকুটিয়া নদীর ওপারে ওনারা গ্রামে যাবেন। তখন অগত্যা মিরান আমার ছোট বোন ওকে নিয়ে খালুজানদের সাথে এক কাপড়ে রওয়ানা দিলাম। যাওয়ার পথে দেখলাম ইংলিশ রোডে রডের দোকানগুলো আগুনে পুড়ছে। মানুষে মানুষে ছেয়ে গেছে রাস্তা। এ দিকের মানুষ ও দিকে যাচ্ছে আর ও দিকের মানুষ এ দিকে আসছে। মানুষ দিশাহারা। আমরা গিয়ে জিগাতলা আমার ফুফাত বোন আতোর বুয়াদের বাসায় নামতে ওনাদের কাজের লোক দৌড়ে এসে বলল, আপনারা তাড়াতাড়ি ভিতরের রাস্তার কোন বাসায় যান এখানে এখনি মিলিটারি আসবে। তাড়াতাড়ি ও আমাদের সাহায্য করল। এর মধ্যে রিক্সাওয়ালা চালের টিন নামাতে ভুলে গিয়ে নিয়ে গেছে তা খেয়াল করিনি। কিছুদূর ভীতরে যাওয়ার পর একটা বাড়ী খোলা পেলাম। চুলায় ভাত হচ্ছে। তারা কোথায় গেছে কেহ জানেনা। আমরা ঢুকতে না ঢুকতে কার্ফিওর সময় শেষ। গুলির আওয়াজ শুরু হল। এমন ভয় ঢুকলো মনে গুলির আওয়াজ হলেই ভয়ে পেট ব্যাথা করে বাতরুম চেপে যেত। সারারাত গুলির আওয়াজ। ঐ বাসায় যা ছিল খালা তা দিয়ে কোন রকম রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমাদের সাথে মিনু বুয়া আমার মামাত

আমার আমি / ২৪

বোন ও তার স্বামী হাকিম সাহেব (কিছু দিন হয় তিনি মারা গিয়েছেন) তাঁরা ছিলেন। রাতে তার ভয়ঙ্কর নাক ডাকায় প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে লাগল। এই বুঝি আর্মি আসল কারণ রাস্তার পাশে ছোট টিনের ঘর তাই শব্দ বাইরে যথেষ্ট যাচ্ছিল। মন ভীষণ খারাপ মা অন্য ভাইয়েরা কে কোথায় কিভাবে আছে জানি না। এ ভাবে প্রায় সাতদিনের মাথায় দাদা খুঁজে বের করল আমাদের, নিয়ে গেলেন দাদার শ্বশুর বাড়ী দিলু রোডে।

২/৩ দিন পর আমরা আসলাম খালেক দাদা আমার ফুফাত ভাই এর বাসায়। এসে দেখি তারা কোথায় গিয়েছে। জানি না তিন পরিবার আমরা মা-মিরান-আমি+মাসিরা+মিনু বুয়ারা। সাথে খান আতাউর রহমান ওনারা আসল মিলে কয়েক দিন থাকলাম। মা সারা দিন জায়নামাজে কারণ আমার ভাই নেহালকে আর্মি ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ১৫ দিন কোন খবর নাই।

১৬ দিনের পর বেলা ১১টায় হঠাৎ দেখি ২টা রিক্সা আমাদের বাসার কাছাকাছি আসছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি একটি রিক্সায় নেহাল আমাদের বাড়ীতে এসেছে। নূর ইসলাম অন্যটায় আমার সেজ ভাই বর্তমানে লন্ডনে আছেন আর খালার ছেলে আলমগীর। বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসছে। জানা গেল ক্যাপ্টেন সালেহ নিজের জীবনের রিক্স নিয়ে ফিরে এসেছে এবং ইন্ডিয়ায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আসলে সব সালেহ রহমত। আমার মায়ের এবং খালার কান্না ও দোয়ার ফল।



মা, সোমা ও শার্লি

এর কয়েক দিন পর দাদা হলি ফ্যামিলির হাসপাতালের উল্টো দিকে সরকারী কোয়ার্টার পেলেন এবং সেখানে আমরা মে মাস পর্যন্ত থাকলাম। তার পর আমরা এবং মাসিরা বরিশাল চলে আসলাম কলাবাগানের বাড়ীতে। স্বাধীনতা পর্যন্ত থাকলাম। বরিশাল সত্যিকার অর্থে ১২ ডিসেম্বর স্বাধীন হয়েছিল। কারণ তখন সকল জেলায় আর্মি ঢাকাগামী স্টীমারে রওয়ানা দিয়েছিল। ইন্ডিয়া তখন সরণার্থি সামাল দিতে বেসামাল তদুপরি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বিমান

আমার আমি / ২৫



বাহিনী দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য করায়, নদী পথে বিভিন্ন স্থান থেকে ঢাকা আসতে পারিনি। পাক-বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আমাদের আবেগপূর্ণ স্বাধীনতার বিজয় দিবস নিয়াজী ইন্ডিয়ান জেনারেল অরোরার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা করে। বাংলাদেশের বিজয় হল, আমরা স্বাধীন হলাম।

আমাদের ঢাকায় নিয়ে আসে ভাই ডি বরিশাল হয়ে স্টীমারে করে। ঢাকায় সে কি ফুলেল সম্রামণ। সত্যি তখন নিজেদের বিজয়ী ভেবে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানালাম। কতদিন পর ফরিদাবাদের সেই বাল্যস্মৃতিময় যা প্রতি মুহূর্তে অভাব বোধ করতাম। সেই নিজ বাস ভবনে ফিরে আসলাম। কিছু দিন ধরে বিজয় উৎসব চলল।



মুজিবনগর, মেহেরপুর

শেখ মুজিবুর রহমান যার জন্ম না হলে বাংলাদেশ হত না। তার দেশে ফিরা নিয়ে কত রকম কথা হচ্ছিল। তিনি নিজেকে ২৫ মার্চ আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের কাছে। তাকে ৯ মাস পাকিস্তানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। জেলখানার পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যাকে বাঁচাবেন তাকে কেহ-ই মারতে পারে না। তিনি ফিরে আসলেন। দেশ গড়ার কাজে ব্যস্তময় জীবন কাটালেন।

আমরা আবার পড়াশুনা শুরু করলাম। ১৯৭৪ সনের ২৫ আগস্ট আমার

আমার আমি / ২৬

বিয়ে হল কুমিল্লাবাসি ইঞ্জিনিয়ার নাম মোঃ ইদ্রিস মিয়া। ঢাকায় কিছুদিন থাকার পর মানিকগঞ্জে বদলী হলাম। এর পূর্বে ঢাকায় থাকা অবস্থায় আমি সেন্ট্রাল গার্লস স্কুলে টিচার ছিলাম। আসলে মাস্টার্স পরীক্ষার ২/৩ দিন পর ঐ স্কুলে টিচার হলাম। আমার বন্ধুর বাবা ছিলেন হেড মাস্টার। তিনি বললেন, গার্হস্থ্য অর্থনীতির টিচার পদ খালি আছে, বসে না থেকে চাকুরীতে যোগ দে। বছর খানেক করলাম। এর মধ্যে বিয়ে তার কিছু মাস পরে মানিকগঞ্জ যাত্রা। ঢাকায় থাকা অবস্থায় খুব ভাল ছিলাম। এক সাথে রওনা দিয়ে কাজ শেষে এক সাথে ফিরতাম। বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘুরতাম। কোন দায় ছিল না। কখনও খেয়ে ফিরতাম। বছর খানেক মান-অভিমান হীন কাটল। এরপর মানিকগঞ্জ আসলাম। এত ছোট শহর মনে হচ্ছে। এলাকা এর চাইতে বড়। হঠাৎ একদিন খুব ভোরে বেল বাজল। দরজা খুলে শুনে শুনেলাম বাঙ্গালী জাতির কলঙ্কময় সংবাদ। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। স্ব-পরিবারে নিজ বাসভবনে। হায় পাকিস্তানি পাকিস্তানিদের হাত কাঁপত যাকে বার বার মৃত্যুর আদেশ



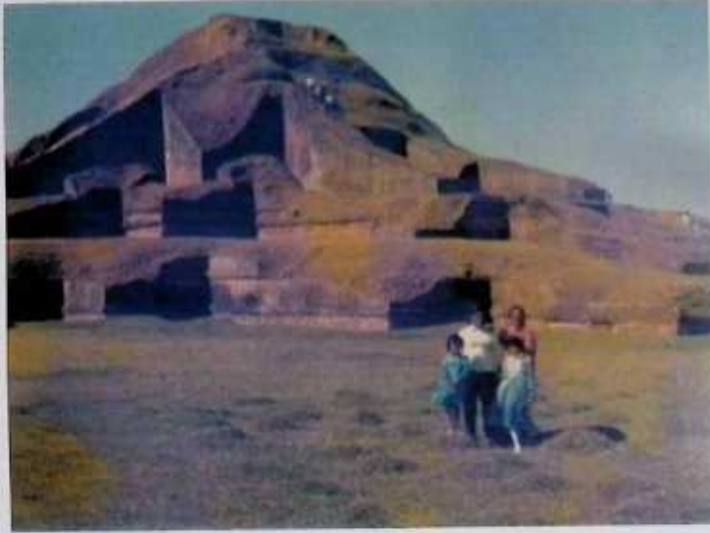
নাটোর রাজবাড়ী

কার্যকর করতে পারিনি। তিনি কিনা নিজ বাসভবনে নিজ বাঙ্গালী, যারা পথ ভ্রষ্ট আর্মি অফিসার-ঘোয়ান তাদের হাতে জীবন দিলেন। নয় মাস যুদ্ধ করে

আমার আমি / ২৭



পৃথিবীর বুকে যারা গৌরবময় ইতিহাস গড়ল তারা আবার কলঙ্কিত হল। ইতিহাসের আন্তাকুড়ে নিষ্ক্ষেপিত হল। এ লজ্জা, এ দুঃখ, ধীক্লার অনন্তকাল বাঙ্গালীকে বহন করতে হবে। যে রাজাকার, মীরজাফর একবার জন্ম হয় তা যুগযুগ ধরে কলঙ্কময় জীবন তাদের পিছু ছাড়ে না। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ বাঙ্গালীর সব চেয়ে দুঃখ-লজ্জার দিন।



পাহাড়পুর, বগুড়া

আমার কথায় আবার ফিরে আসি। সেই সুলতানা নামটি ধীরে ধীরে মিসেস ইদ্রিস হয়ে পরিচিতি লাভ করল। ১৯৭৮ সালে ১০ ডিসেম্বর আমার জীবনে নতুন অধ্যায় শুরু হল। আমি প্রথম মা হলাম। আমার সুস্থ কন্যা সন্তান হল। শুক্রবার জুম্মার আজানের সময় হওয়ায় ওর নাম রাখল সুখী, ওর বাবা। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া। এর পর ঢাকায় বদলী তারপর ইদ্রিস মিয়া খ্রীজ ট্রেনিং-এ জাপান গেল। তিন মাস ঢাকায় আপার বাসায় থাকলাম। তিন তলায় আপারা তখন ভোলায় ছিলেন।

যাদের জন্য পৃথিবীর আলো বাতাস, সুখ-শান্তি তারা হলেন জন্মদাতা মা-বাবা। মানুষের জন্ম-জন্মান্ত সম্পর্ক মা-বাবা, রক্তের সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক যা কোনদিন ফিকে হবে না। সব সন্তান মা-বাবা নিঃস্বার্থ সম্পর্ক বিশেষ করে মা-বাবার।

আমার বাবার কথা শুরুতে বলছি ১১ সন্তানের গর্বিত বাবা আল্লাহর রহমতে ভাল অবস্থানে সকলেই নিজস্ব নিবাসে বসবাস করেছে। শুধু মেজ ভাই অকালে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। বাবা অত্যন্ত রাগী মানুষ ছিলেন উপরে। ভিতরে একজন নরম মানুষ ছিলেন। বাবা হিসাবে শুধু নয়, মার স্বামী হিসাবে ভীষণ আন্তরিক এবং মার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। যেমন সময় মত খাওয়া, ছুটির দিন মাকে বিশ্রাম দেওয়া মনে করিয়ে দিতেন, যা বর্তমানে নেই বলতে গেলে। আমি কোনদিন বাবা-মার উঁচু গলায় কথা বা ঝগড়া করতে দেখিনি। সব সময় সম্মান দিয়েছেন তাই মা ১১ সন্তানের কাছ থেকে কখনও অবহেলা পাননি এটা পরিবার থেকে শেখা নারীর প্রতি সম্মান।

আমার মা... ছোট একটি শব্দ কিন্তু বিশালতার মহিমা। আমরা কোনদিন মার মুখ কালো অথবা অসুস্থ, উদাসিন দুঃখ কিছুই দেখিনি। এতবড় বিশাল সন্তান বাহিনী তদূপরী মেহমান নিয়ে সব সময় খুশীর একটি মহল ছিল আমাদের বাসায়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশির যত সমস্যা সমাধান করতে পারতেন সমাধানের। তিনি বৃটিশ আমলে এনট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম মেডেল পাওয়া বিদূষী নারী ছিলেন। আপওয়া মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠাতা। কিছুদিন কামরুননেসা স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। আমরা মেয়েরা তার সাথে থেকে এই গুণ কিছুটা পেয়েছি। বাবা মারা যাওয়ার সময় আমার বাবাচর্যে ছোট ভাই তুরান অনেক ছোট শিশু ছিল কারণ আমি তখন প্রথম সর্বোচ্চ এইচএসসির ছাত্রী ছিলাম। কত ধৈর্য থাকলে একটি মা তার সন্তানের নিয়ে সুদীর্ঘ মরুপথ পার হয়েছেন। বাবা মারা যাওয়ার ৩২ বছর পর তিনি মারা গিয়েছেন। ১১ সন্তানের মাত্র বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল আর মেজ বোনের আকত হয়েছিল। বাকী ৯ জনের শিক্ষা-সামাজিকতা বিয়ে সব একহাতে করেছেন তিনিই। আমাদের মাদার তেরেসা, বেগম রোকেয়া, সুফিয়া কামাল, নবাব ফয়জুননেসার মত অনেক উদার মনের সামাজিক কাজ করেছেন এবং শিখিয়েছেন। তিনি আমার আদর্শ চলার পথের অনুপ্রেরণা। তার আত্মার শক্তি হোক, অসুস্থ, মন খারাপ কষ্ট সব তিনি তার স্নেহের স্পর্শে ভুলিয়ে দিতেন। আমি যখন ছোট খাট প্রবন্ধ লিখতাম তিনি চিলেন আমার প্রথম পাঠক। মায়ের মত ভালবাসা, খেয়াল রাখা আসলে আর কেহই করে না। “শুধু মা নেই, চশমাটা পড়ে আছে” গানটি এতই জীবন্ত শুনলেই চোখে পানি আসে। মা তোমার সন্তানরা তোমার আদর্শে মেনে চলছে তুমি ভাল থেকে। নানু তুমিও ভাল থেকে। তোমার স্পর্শ অনুভব করি এখনও। প্রতিটি বিষয় নানুর আদর ভূলা যায় না।





লন্ডন-মহুয়া, সোমা, সুখী, শিমু

মা হওয়া সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। মনে হচ্ছিল আমার মাকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল জিনিস দিব কারণ তিনি আমাকে জন্ম না দিলে এই অনুভূতি এবং আমি মা হতে পারতাম না। ঐশ্বরিক আনন্দ অনুভব করতে পারতাম না। এ এক পরম পাওয়া, নারী জন্ম স্বার্থক।

আমি সত্যিকারের পরিপূর্ণতা নিয়ে সংসার জীবন শুরু করলাম। বড় কন্যা জন্ম হল ঢাকায়। ৩ মাস ব্রীজের উপর জাপান থেকে ট্রেনিং নিয়ে ঢাকায় মিরপুর সড়ক গবেষণাগারে এক বছর থাকলাম।

এর পর রাজ্যমাটিতে বদলি হল। ঢাকার বাসায় রেখে মাঝে মাঝে রাজ্যমাটি যেতাম। ২ বছর পর রাজ্যমাটিতে বাড়ী পেলাম কাচের ঘেরা সুন্দর পাহাড়ের উপর স্বপ্নের মত। আসলে এই বাসাগুলি অস্ট্রেলিয়ানরা তাদের জন্য করেছিল তাদের রোড প্রজেক্ট, প্রজেক্ট পিডি হিসেবে ঐ বাসা পেলাম। ঢাকার বাসা ছেড়ে চলে আসলাম পাহাড়ী নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য আলোকিত রাজ্যমাটিতে। ভীষণ সুন্দর সময় কাটল তিনটি বছর। পাহাড়ী সৌন্দর্য্য বর্ণালেক মাঝে মাঝে দল বেধে বেড়ান খুব মজার সময় কাটছিল। এর মধ্যে দেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হল। এরশাদ সরকার শুরু হল। রাজ্যমাটি শেষের দিকে আমার ছোট কন্যা ১৮ এপ্রিল জন্ম হল।

আমার আমি / ৩০

সে আরেক অনুভূতি প্রায় পাঁচ বছর আবার সেই স্বর্গীয় আনন্দ। তবে দ্বিতীয় বার মা হতে শরীরটা একটু বেশী দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বছর খানেক পর আবার বদলি।

এবার আরও ভালস্থান কক্সবাজার সমুদ্রের কাছে মটেল রোডে বিশাল বড় বাগানসহ বাড়ীর পিছনে সমুদ্র। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করলাম আমার দুর্বলতা আন্তে আন্তে ঠিক হল কক্সবাজারের বাতাসে। কক্সবাজারে ছোট বাচ্চাদের স্কুল না থাকায় আমার বাসায় সব অফিসারদের বাচ্চাদের নিয়ে “শিশু নিকেতন” নামে স্কুল করেছিলাম। অফিসারদের মিসেসরা শিক্ষক ছিল। ডিসি সাহেবের মিসেস সভাপতি আমি অধ্যক্ষ ছিলাম। অনেকটা লন্ডন-মহুয়া ঘোলে মিটানোর মত। খুব আনন্দে কাটাচ্ছিলাম দিনগুলো।



সুখী ও পাঙ্খু-বিয়ের ছবি

এবার রাজশাহী উত্তর বঙ্গ। কোনদিন যাওয়া হয়নি। ভীষণ মন খারাপ লাগল। সকলের সাথে একটা চমৎকার বন্ধন হয়েছিল। ছেড়ে যেতে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। রাজশাহীতে পেনে করে আসলাম। নেমেই মন আরও খারাপ হয়ে গেল। গাছপালা শূণ্য বিশাল ক্যাম্পাস নতুন গাছ লাগাবে। খরখরে রোদ-গরম। কোথায় রাজ্যমাটি-কক্সবাজারের পাহাড়-সমুদ্র-বনভূমি সবুজ

আমার আমি / ৩১



ঘেরা নান্দনিক সৌন্দর্য্য লেক-দ্বীপ। যাই হোক বনবিভাগের পরামর্শে ইপিলিপির গাছ দ্রুত বড় হয়। তাই চতুর্দিকে লাগান হলো। তারপর আম, কাঠাল, লিচু ও নারিকেল গাছ অনেক বাগান হল। ব্যাডমিন্টন-টেনিস খেলার উপযোগী ক্লাবও করা হল। প্রকৌশলী গৃহিণী “সখী” ক্লাব, বোয়ালিয়া ক্লাব অফিসারদের পূর্বেই ছিল। সংখ্যায় প্রকৌশলীদের পরিবার ছিল বেশী। তাই আমাদের অনুষ্ঠান লেগেই থাকত।



স্কটল্যান্ড, লেকলম ডিস্ট্রিক্ট-শেলী আপা, তুরম ও আমরা

শালবাগানে আমাদের সড়ক জনপথ আবাসিক আমরা প্রায় ১০০ জনের বিশাল পরিবার। কোন না কোন অনুষ্ঠান লেগেই থাকত। আমার বড় মেয়ে কল্পবাজার থাকতেই গান শুরু করেছিল। কিন্তু রাজশাহীতে ওস্তাদ রবিউল স্যারকে পেয়ে নতুন করে আবাব প্রশিক্ষণ হল। বিশেষ করে উচ্চারণ কারণ উনারা সকলে শুদ্ধ উচ্চারণ গোষ্ঠির সদস্য।

ছেটদের নতুন কুঁড়ি ছাড়া অনেক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় নাম-সার্টিফিকেট পেল। ১৯৯২ সনে প্রথম আমেরিকায় গেলাম। সেখানে বিবিএন চ্যানেলে আমার মেয়ে সুখী গান করল এবং প্রচার করায় আমি রেকর্ড করে রাখলাম। সেদিন যে আমার কি আনন্দ হয়েছিল বলে বোঝানো যাবে না। বিভিন্ন স্থান থেকে চেনা-যানাদের ফোন আসায় আমার ভীষণ

আমার আমি / ৩২



লডনে মহয়া ও আমরা

আমি লাগল। অনেক আনন্দ হচ্ছিল হঠাৎ সব খুশী-আনন্দ তখনই করে ফেলল একটি খবর মেজ ভাই নেই। আমরা আমার ছোট ভাই এর বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে খুশী হৈ চৈ করত সেই মেজ ভাই সেই। পরলেই বিষণ্ণ মন উদাসিন হয়ে যায়।

প্রথমে শুনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ছোট ভাই এর বিয়ে। সকালে মার বাসায় একত্র হচ্ছিল। হঠাৎ বজ্রঘাতের মত। মেজ ভাই ছিল আমাদের খুশী-আনন্দের কেন্দ্র বিন্দু। কারণ বড় ভাইকে আমরা বাবার মত শ্রদ্ধা করি এবং একটু ভয় করি। বিশেষ করে বাবা মারা গেলেন ১৯৬৬ সনে দাদা তখন পশ্চিম পাকিস্তানে সিএসপি ট্রেনিংরত। যখন দাদা ফিরলেন তখন বাবার দায়িত্ব সবটুকু নিজ কাঁধে নিয়ে বিদেশ মিশনে পোস্টিং না নিয়ে ঢাকায় আমদানী-রপ্তানী ব্যুরো নিয়োগ পেলেন। শুধু আমাদের সকলের কথা চিন্তা করে তার এই বিশাল ত্যাগ আমরা কখনও ভুলি নাই, ভুলবও না। কিন্তু মেজ দাদা ছিল আমাদের সকলের বন্ধুর মত। মন খারাপ থাকলে এক মিনিটেই ভাল করে দিতেন। শীতের রাতে রোজার সময় আমরা শীতের ভয়ে সেহেরি খেতে উঠতে চাইতাম না। মেজ ভাই গরম পানি এনে লেপের ভেতর থেকে হাত বার করে ধুইয়ে দিতেন। মার বকা

আমার আমি / ৩৩



খেলে সিনেমা দেখাতে কিংবা দোকানে নিয়ে কিছু কিনে দিতেন। মা ভাইয়াকে বকলে বাবার জন্য বিশেষ ভাবে রান্না নরম গোশ খেয়ে মাকে বেকায়দায় ফেলতেন। মা বকা দিলে বাবা আসা পর্যন্ত একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সে অনেক স্মৃতি যা বারবার মনে পরে।

শেষ দেখা মনে করে ভীষণ কষ্ট হয়। মেজ ভাই-ভাবী ম্যারেজ ডে চুপি চুপি উদযাপন করতে যাচ্ছিল। আমি দেখে ফেলে সকলকে বলে দিলাম। ফলাফল সকলে একত্র হয়ে সেখানে হাজির। খাওয়া-দাওয়ার পর মেজ দা হাত উঁচিয়ে সকলকে বিদায় দেওয়ার ভঙ্গি। আজও চোখে ভেসে উঠে, কানে বাজে সেই সব কথা। যা আর শোনা হবে না। সুলতানার (আমার নাম) জন্ম আজ এত মজা করে সকলে আনন্দ করলাম। সেই রাতে মেজ ভাই লন্ডন চলে গেলেন। আর কথা বললেন না। বয়ে করে অনন্তকালের ঘুম দিয়ে দেশে আসলেন। কষ্টে-দুঃখে কান্না ভুলে গেলাম। এর পর আসল আর একটা ধাক্কা মেজ ভাই দেশে আসলেন কফিনে। তখন মিহিরের বিয়ে। এর পর আবার ঘটল তুরানের বিয়ের ৩দিন পর মিহিরের বৌ ঝর্ণা হঠাৎ স্ট্রোক করে বারডেম হাসপাতালে মারা গেল। বাবার মৃত্যুর অনেক পরে ভাই ডি, মেজ ভাই এর পর ঝর্ণা পর পর মারা গেল। ভীষণ কষ্ট ও



ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি



মাদাম তোসা লন্ডনে আমরা

কষ্টে-দুঃখে-আনন্দে কষ্টে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ থেকে সংসার জীবন

১৯৯১ সনে ঠিক করলাম যাযাবরের মত বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঢাকায় বাচ্চাদের পড়াশুনা করাতে হবে। শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য ক্যান্টেনমেন্ট স্কুলে পড়াতাম। ১৯৯১ সনে ঢাকা বনানী বিদ্যা নিকেতনে ভর্তি করে পরে শাহীন স্কুলে অনেক কষ্টে সিট পেয়ে ভর্তী করলাম।

এর মধ্যে ৩/৪ বার লন্ডন, আমেরিকা বেড়লাম। আমি নিজেও ঢাকা উইমেন কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা শুরু করলাম। সাথে সাথে উত্তরা লেডিস ক্লাবের সদস্য হলাম। ঢাকার বাইরেও আমি ছোট ছোট নারী সংগঠন করেছিলাম।

সুখে-দুঃখে-আনন্দে কষ্টে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ থেকে সংসার জীবন

সুখে-দুঃখে-আনন্দে কষ্টে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ থেকে সংসার জীবন



যাত্রা শুরু করে ঢাকা রাজমাটি-করবাজার-রাজশাহী-রংপুর অর্থাৎ টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে ১৯৯১ সনে ঢাকায় ফিরে একাই বাচ্চা নিয়ে আরও কঠিন জীবন যাত্রা শুরু করলাম। আমার সব সময় ইচ্ছা ছিল শাহীন স্কুলে বাচ্চাদের পড়ার। নয় মাস রীতিমত যুদ্ধ করে বড় মেয়ে সুখীকে জুন মাসে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়ে ভর্তি হল শাহীন স্কুলে। ছোট কন্যার মন খারাপ। কারণ ৩য় শ্রেণিতে কোন সিট ছিল না। চুন্নাভাবীকে নিয়ে বহু কষ্টে নভেম্বর মাসে একটা সিট খালি হওয়ায় ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে পূর্ণ নম্বর পেয়ে ভর্তির সুযোগ ফেল। তখন নয় মাস ব্যবসার রোডে আমার বড় বোনের বাসার কাছে জীবনে এই প্রথম ভাড়া বাড়ি বাস করতে উঠলাম। দীর্ঘ ১১ মাস একটা কঠিন সময় পার করলাম। কারণ আমার স্বামী সরকারী প্রকৌশলী, সড়ক-জনপথ ইচ্ছা করলেই বদলী হতে পারতেন না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় মেয়েদের ভাল স্কুলে বড় প্রাঙ্গনে পড়ায় ঠিক হয়ে বড় হয়। কারণ আমরা ঢাকায় ছোট থেকে মানুষ। সুতরাং আমরা ঢাকার স্কুল থেকে গেলাম। কিছুদিন পর আমার স্বামী ঢাকায় বদলী হওয়ায় আমরা নিজ বাসা উত্তরায় চলে আসলাম। কিছুদিন পর উত্তরায় ঢাকা উইমেন কলেজে চাকুরী নিলাম প্রভাষক হিসেবে। দীর্ঘ ১৫ বছর পর চাকুরী, স্বামী, নিজ পড়াশোনা। উত্তরা লেডিস ক্লাবে মেঘার হলাম। অনেকের প্রশংসা বলতঃ আপনি এত কিছু করেন কি করে?

উত্তরে আমি বলতাম ২৪ ঘন্টা বিশাল সময়। প্রতিটি কাজ যদি আমরা সঠিক সময় করি তবে অসুবিধা হয় না। আমার বড় মেয়ে সুখী বর্তমান শাহীন স্কুল থেকে। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। দু'টি সুস্থ সুন্দর ও সন্তান কন্যা সন্তান দিয়েছেন। ওদের আমি বাসায় পড়াতাম। এসএসসি দেওয়ার পূর্বে আমার কলেজের দু'জন টিচার লাভলী আপা ও ফারুক (অঙ্ক) সাহেব করতো নিজ সন্তানের মত। ৫টি বিষয়ে লেটার নিয়ে স্টার মার্কস পেয়ে এসএসসি পরে হলিক্রস কলেজ থেকে এইচএসসি ও পরবর্তীতে নর্থ-সাউথ থেকে বিবিএ ও এমবিএ করল।

সুখী বিবিএ পড়াকালীন আমার জীবনে আর একটি অধ্যায় শুরু হল। অর্থাৎ আমি স্বাভাবিক হলাম। পাশ্চাত্য চমৎকার মেধাবী ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় প্রথম ক্লাস পাওয়া এরিকসন মোবাইল কোম্পানীতে চাকুরী করত। একটি হাসি-খুশী বোন পর্শিয়া বাবা বিটিভি টীপ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমাদের মতন একই সমান পরিবার। আল্লাহর রহমতে বিয়ে হয়ে গেল ২০০০ সনে। দু'পরিবার ৮জন মিলে খুব সুন্দর আনন্দময় জীবন।

সর্বত্র একসাথে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া লেগেই থাকত।

একই সাথে আমার চাকুরী জীবনের উন্নতি বিভাগীয় প্রধান হলাম। আমাদের কলেজ অনার্স খোলা হল ২০০৭ সনে। গার্হস্থ্য বিভাগে ২য় ব্যাচের নীতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডারে সকল কলেজ মিলে প্রথম হল। এটা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ খবর ও আনন্দ আব দু'জন ৭ম ও ১৬তম হল। শিক্ষকতা জীবনে আমার পরম পাওয়া পরবর্তীতে নীতু ইডেন কলেজ থেকে মাস্টার্স প্রথম ক্লাস প্রথম হল। বড় করে সম্বর্ধনা দিলাম কলেজ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। এখনও ও আমার সন্তানের মত। সব সময় যোগাযোগ রাখছে। আমার বড় পাওয়া ২০১০ সনে অবসর নিয়েও আমি সব সময় কলেজের সম্মিলিত হই যে কোন অনুষ্ঠানে। আল্লাহর কাছে টিচার হিসাবে এমবিএ পর জন্য শুকরিয়া। অশ্রুসিক্ত সকল শিক্ষক, অধ্যক্ষ নিজে গাড়ীর দরজা খুলে আমাকে বিদায় জানালেন। শিক্ষকবৃন্দ হীরার আংটি দিয়েছিল। মানুষ বেশী দিন একই খুশী-আনন্দে থাকতে পারে না। আমার বাস্তব জীবনে আমার অনুভব করেছি সে কথায় পরে আসছি।



আমরা ৫ (পাঁচ) বোন

এবার আমার ছোট কন্যা সোমার কথা। চুপচাপ ছোট বেলায় মাথা নেড়ে বেশীবার কথার উত্তর দিত। ওকে মাত্র ২ বছরের নিয়ে রাজশাহীতে





ওয়াশিংটন ডিসিতে আমরা ক'জন

বদলী হলাম। প্রচণ্ড গরম সহ্য হতে সময় লেগেছে। বড় মেয়েকে লেখা সেখানে যে কষ্ট হয়েছে ছোটটা যে কখন টেবিলের উপর বসে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আঁকিবুঁকি করতে শিখে গেল বুঝতেই পারলাম না। আগেই বলেছি বাসায় আমিই পড়াভাষা-লেখাতাম। সোমা দেখে দেখে লিখে গেল। তখন ১৯৮৫-১৯৮৬ সন টিভি দেখার সময় খুব একটা হত না। আগ্রাহর কাছে শুকরিয়া যে ওরা কখন প্রথম-দ্বিতীয় ছাড়া হত না। সোমার অতি অগ্রাহে ওকে একটু বেশি ছোট বেলায় রিভার ভিউ স্কুল-এ দিলাম। নার্সারি ক্লাসে। কারণ তখন সুখী ঐ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল। রোজ বায়না করায় দিলাম ভর্তি করে। কিন্তু কিছুদিন পর ওর অত ভোরে উঠে রেডি হতে ভাল লাগছিল না। তাই আর জোর না করে ৬ মাস পরে নার্সারীতে ভর্তি করলাম। বড় কন্যা সুখীর স্কুলের প্রথম দিন ছিল আমার তীষণ ভয় কিন্তু সে প্রথম দিনেই হাত নেড়ে আমাকে চলে যেতে বলেছিল অন্য হাতে টিফিন বস্ত্র থেকে সব টিফিন মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। তবুও সে পারবে ভেবে আমাকে চলে যেতে বলছিল। সোমার বেলায় ভাবলাম ও একই ব্যাপার করবে। কিন্তু ফল হল উল্টা, তার কান্না শুরু হল অনেক বুঝানোর পর আমাকে ক্লাসের পাশের রুমে বসতে বলল। কারণ একটু পর

আমার আমি / ৩৮

পর এসে আমাকে দেখে ঘ্রাণ নিয়ে যেত। কি যে বিব্রতকর অবস্থা ধীরে ধীরে বলল, “তুমি দিয়ে যাবে ক্লাসে আর স্কুল ছুটি হলে ক্লাসের সামনে দাঁড়াতে হবে। তাই করলাম কয়েক মাস। পিটি করানোর সময় আমাকেও সাথে ওদের পিটি করতে হত। তীষণ ভিত্ত ছিল। এর পর বদলী হয়ে গেলাম রংপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে। সেখানে প্রথম দিন প্রিন্সিপাল স্যার ওদের দুই বোনকে নিয়ে ক্লাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সোমার কান্নার কোন শব্দ হত না। কিছুক্ষণ পর ওর ক্লাসের মেয়ে বের হয়ে জানালায় সোমা কাঁদতে কাঁদতে প্রায় বেহুস। মার মন থাকতে না পেরে দৌড়ে ক্লাসের ভিতর বিনা অনুমতিতে ঢুকে গেলাম। যাক এইভাবে কোন রকম আরও এক-একটি গেল।



সাতার স্মৃতিসৌধে মহুয়া, সোমা ও সুখী

এবার ১৯৯১ সন প্রথম লন্ডন যাব। আমার ভাই-বোন লন্ডনে থাকে। সরকারী চাকুরীর অধু হাতে আমার স্বামী কোন রকম বিদেশ যাওয়ার পক্ষপাতি না। আমার ১১ ভাই বোনের ভিতর বিভিন্ন দেশে থাকে ৬ জন। তাদের পরিবার নিয়ে লন্ডনে থাকে ৩ ভাই। ম্যানচেস্টারে থাকে ১ বোন ডাক্তার। লন্ডনে ভাই ৩ জন সিএ। বড় ভাই যেহেতু ফরেন সার্ভিস। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে থাকেন। আর ১টি বোন আমেরিকা থাকে।

আমার আমি / ৩৯



ভাগ্না-ভাগ্নি-ভাসতি ৬ জন থাকেন বিভিন্ন দেশে। বড় ভাই যখন চায়নায় তখন ভীষণ ইচ্ছা ছিল নানা কারণে যাওয়া হয়ে উঠেনি। পরে অবশ্য হংকং হয়ে চায়না গিয়েছিলাম ১৯৯৭ সনে হংকং হ্যান্ডওভার সময় ১৯৯১ জুলাই মাসে দু'মেয়ের প্রথম টার্ম পরীক্ষা শেষ করে ঢাকায় এসে এরোফ্লোট এয়ারলাইন্সে মক্কো হয়ে লন্ডন যাব। জীবনে এতদূর ২ মেয়ে নিয়ে ভয় ভয় করছিল। কারণ আমার স্বামী বেড়ান উৎসাহী না। আর ভাই-বোন প্রতিবার এসে যাওয়ার জন্য বলে। মেজ বোন ডাক্তার সে টিকেট করে পাঠালো আমি সাহস করে ভিসা নিয়ে আল্লাহর নামে রওয়ানা হলাম। এরোফ্লোট গেলাম কারণ মক্কোর লেলিনদ গ্রান্ড দেখব বলে। আমার ছোট বেলা ছাত্রী অবস্থায় পাকিস্তান ভ্রমণ করেছিলাম। দেশ ভ্রমণে প্রবল ইচ্ছা ছিল। ভাবলাম প্রকৌশলী স্বামীকে নিয়ে ছুটি-ছটায় এদিক-সেদিক ভ্রমণ করব। ওর বন্ধু-কলিগ সকলেই কমবেশী যায়। ওর কথা বিনা কাজে সরকারি অফিসার বেড়ান ঠিক নয়। যা হোক আল্লাহর নামে ২ কন্যা নিয়ে এয়ারপোর্ট এসে নিজের গরজে একটা দল গঠন করলাম। যার মধ্যে কম বয়সী ডাক্তার ছেলে ছিল তাকে টিম লিডার বানালাম। কারণ সে ২/১ বার লন্ডনে এসেছে। ভোর রাতে এসে আমরা পৌঁছলাম মক্কো এয়ারপোর্টে। রাত তখন ৩-৪ টা হবে। নিশ্চুপ কোন মানুষজন নেই শুধু আমরা কয়েকজন আর ইমিগ্রেন্ট অফিসার। জীবনে এই প্রথম বিদেশ তা আবার



সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমার ছোট মেয়ে সোমা ও আরো অনেকে



সোমার সাথে আমার ক'জন

বড় ভাইকে তখন হেসে যেতে বলল। আর পাসপোর্ট ধুমধুম করে এন্ট্রি দিয়ে দিল। প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। কারণ মেয়েরা আমাকে নিয়ে দাঁড়ান। যাক আল্লাহ আল্লাহ করে প্রথম পরীক্ষা পাস। পরের পর পর বনেনকটিং ফ্লাইট। আমাদের নিয়ে গেল ২৫ তলা উচ্চ এটাস্ট হোটেলে এরোফ্লোট। ওরা ইংরেজ বলতে চায় না। তবুও হোটেলে ম্যানেজারকে কোন রকমে বুঝালাম আমরা ৭/৮ জন একই ফ্লোরে রুম চাই, কারণ আমরা গ্রুপ। কপাল ভাল সেই ভাবে রুম পেলাম। আমার রুমে আমরা ৩ জন। তাই ওরা একটা এক্সট্রা বেড দিয়ে দিল। দেবী না করে প্রেনের কিছু খাবার ব্যাগে নিয়েছিলাম মেয়ে দু'টিকে দিলাম ওরা খেয়ে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। কারণ সকাল ছাড়া নাস্তা করা হবে না। এই বুদ্ধি দিয়ে ছিল আমার ছোট ভাই এর বৌ ডলি। কারণ শুকারের খাবার বেশী। তাই ও আমাকে বলেছিল কোক, বিস্কুট, ব্রেড, মাখন, চকলেট ফল যা খেতে পারব না, তা যেন ব্যাগে রাখি। সত্যি বুদ্ধি কাজে লাগল। তার জন্য ধন্যবাদ ডলিকে। কারণ সকালের নাস্তায় যে খাবার দিয়েছিল পাথর বোধ হয়, ওর চাইতে নরম। যা হোক কিছুক্ষণ পরে জানাল আমাদের লেলিনদগ্রান্ড দেখাতে নিবে চার ডলার আর পাসপোর্ট জমা দিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ভীষণ মজা অনুভব করলাম। দুঃখের বিষয়-এমন একটা ঘটনা ঘটবে যার জন্য কেহ-ই প্রস্তুত ছিলাম না।





জন্মদিনের একটি দৃশ্য



দুই কন্যা-সোমা ও সুখী

আমার ছোট মেয়ে তখন মাত্র ৬-৭ বছরের ছোট কিন্তু ভীষণ চঞ্চল। বড় মেয়ে যেমন শান্ত তেমনি ছোটটা ভীষণ চঞ্চল। আগেই বলেছিলাম আমরা একটা দল গঠন করেছিলাম ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে। নাস্তা করে দলের সকলে এর কাছে একত্র হচ্ছিলাম। এর মধ্যে আমার ছোট মেয়ে সোমা ফট করে লিফটে গুটার সাথে সাথে স্টার্ট হয়ে গেল আমি সোমার একটা চিৎকার শুনলাম আম্মু ... বলে। তাকিয়ে দেখি লিফট চলতে শুরু করেছে। উঠার জন্য কোন সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই। ২টা লিফট উঠা নামা করেছে। ইংরেজি বোঝে না। সিকিউরিটিতে যে মহিলা ছিলেন আমার চিৎকার হেলপ ... আমার দল এবং অন্য লোকজন লিফট চাপা শুরু করল। হোটেল টা ছিল ২৫ তলা। আমরা ছিলাম নবম তলায় আপ-ডাউন হচ্ছে। কি অবস্থা (আমার তখন মনে হচ্ছিল কেয়ামত হচ্ছে)। দোয়া পড়ছি এত বড় হোটেল এটাস্ট এয়ারপোর্ট। আমার মেয়ে হারিয়ে গেলে আমার কি হবে। আল্লাহ ডাক শোনে সব মিলিয়ে ২-৩ মি. হবে, আমি প্রায় অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম। তখন তাকিয়ে দেখি ৮ ফিট লম্বা এক নিগ্রো ভদ্রলোক লিফট খুলে আদরের মেয়ে তার হাঁটুর নীচে হাত ধরে কাঁদছে। এসে দাঁড়াতেই আমার মেয়ে ছুটে আমাকে গুড়িয়ে কাঁপছিল আর কাঁদছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন is it your child? আমি মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম কারণ তখনও আমি বাকবুদ্ধ।

এরপর সেই লেলিন্দ্রান্ড দেখে অভিজ্ঞতা হলো। অনেক গুম্বুজ সব স্বর্ণ দিয়ে মোড়া। ৬ ঘন্টা মস্কো শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে গেল।

তারপর হিতরো এয়ারপোর্টে সন্ধ্যায় পৌঁছলাম। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া জানিয়ে এয়ারপোর্টের সব নিয়ম মারফিক কাজ শেষ করে বের হয়ে যখন সেজ ভাই জাহাঙ্গীর দাদার চেহারা দেখলাম মনে হল-ওরে বাবা বাঁচলাম। ভয়-ভর অবশ্যও শুরুতে যা হচ্ছিল ক্রমশ ধাপে ধাপে কমে আসছিল। গাড়ীতে বসে প্রথমে তাকিয়ে এত আলো এবং একাই ডিজাইনের বাড়ী শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছিল যেন কোন গল্পের রাজত্ববনে আসলাম। আল্লাহর কাছে আবারও শুকরিয়া করলাম। বাসায় পৌঁছে দেখি সকলে ভীষণ আত্মহারা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। ভীষণ ভাল লাগল। আমার মেজ ও সেজ ভাবী দু'জনেই আমার খালাত



ফরিদপুর পন্থায় আমার স্বামী ও জাহাঙ্গীর দা'ভাই

বোন এবং ওরা দু'জন আপন বোন। তাই কোন নতুন করে কেমন কেমন লাগা নয় মনে হল অনেকদিন পর ছোট বেলা ফিরে আসলাম। অনেক বড় পাবদা মাছ দেখলাম সেজ ভাবীর নাম লীনু ও মাছ খুব ভাল রান্না করে মুরগীতে একটু দুর্বল সেটা আমি একদিন দেখিয়ে ছিলাম।

যাক পরের দিনে গল্প-গুজব করে, কাল কোথায় যাবো সব প্ল্যান করা হল। কারণ লন্ডনে ছিল ছোট ভাই, সেজ ভাই, মেজ ভাই ও পরিবার। এ ছাড়া ম্যানচেস্টারে ছিল মেজ বোন। আমার তিন ভাই সিএ আর বোন ডাক্তার। দুলাভাই ও তার মেয়ে মছ্যা ডাক্তার। তাই এক মাস ছুটির মধ্যে





আমাদের সন্তানেরা কবি সুফিয়া কামালের সাথে



বেগম নূরজাহান আপার সাথে আমি

কে কোথায় নিয়ে বেড়াবে সেই ব্যবস্থা হল। ম্যানচেস্টারে বোন নিয়ে যাবে Scotland, Wells Menchester এদিক-সেদিক। ছোট ভাই লন্ডন প্রোপারে, সেজ ভাই Cambridge এবং Oxford University ছাড়া Regent Part, Zoo and Buckingham Palace মেজ আপা ও দুলাভাই এই প্রথম একসাথে ৭ দিন ছুটি নিয়েছে। ভীষণ ভাল লাগল। স্বপ্নের রাজ্যে বেড়াতে বেড়াতে কখন যে ফেরার সময় ঘনিয়ে আসল। এর পর আমি মেয়েদের নিয়ে আরও ২/৩ বার গিয়েছি। Last ২০০৫ দল বেধে Dhaka to Dubai-London-USA-Canada লম্বা Tour ছিল। আমরা অর্থাৎ বড় আপা, জাকির, রিতা, সাফওয়ান এবং রিতার বাবা-মা।



তেতুলিয়ায় আমরা

সেই বেড়ানটা খুব মজা ছিল। শুরুতেই একটা মজার ঘটনা। সকলের ধারণা ছিল ১ ঘন্টা আগে রিপোর্ট করলেই হবে। বেশ টিলাঢালা ভাবে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি Imigration কোন লাইন নেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা। আমরা ভাবলাম বোধ হয় বেশী আগে এসে গেছি। জাকির জিজ্ঞাসা করতে গেল এক অফিসারকে ব্যাপার কি? উত্তর শুনে আমরা হ্যাঁ ... দু'ঘন্টা আগেই সব যার চেক শেষ, প্লেন অলরেডি রানওয়েতে আমাদের মাথায় বাড়ি, জানলাম এখন থেকে ৩ ঘন্টা আগেই রিপোর্ট করতে হয়। আমরা মন খারাপ করে হতাশ দৃষ্টিতে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম





আহসান মঞ্জিলে আমি



আমার কলিক ও ছাত্রী নিতু

কি হবে? ৮টা টিকিট। হঠাৎ ম্যানেজ করা শক্ত কাজ। তার চাইতে বিপদ দু'বাই Hotel booking হয়ে আছে Change booking ticket জাকির বলল আপনারা বাসায় যান দেখি কি করা যায়। জাকির ও ওর স্বস্তর এয়ারপোর্ট থেকে সৌজা ট্রাভেল এজেন্সিতে চলে গেল। রিতা ও রিতার মা কাজের বুয়াকে ছুটি দিয়ে ছিল। যাক আমি উত্তরায় তখন থাকলাম। সকলকে নিয়ে আসলাম দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে যে যার বাসায় চলে গেল।



জন্মদিনে মা সহ আমরা কয়জন

২দিন পর টিকিট ম্যানেজ হল। আমরা দুবাই টুর দিন কমিয়ে অন্য চেইন Program সব ঠিক রাখলাম।

আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করলাম। আমেরিকা ৭বার, লন্ডন ৪ বার, হংকং, সিঙ্গাপুর, চায়না, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া, ইস্তাম্বুল, পাকিস্তান, দুবাই, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, বাংলাদেশ প্রায় টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া।

২০০৮ সানে আমি আল্লাহর রহমতে নানী হলাম। সে যে কী খুশি-আনন্দ বলে বুঝানো যাবে না। শুধু যারা নানু-দাদু হয়েছেন তারাই অনুভব করতে পারবে। আগেই বললাম বেশিদিন আল্লাহ আনন্দ-দুঃখ কোনটাই



স্থায়ী করেন না। মনে হয় মানুষ আল্লাহকে তখন ভুলতে বসে। তাই বিনা বাতাসে বাড় আসল আমার পরিবারে। পর পর কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। নাতনী পেলাম নাম সামায়েরা। মাশাআহ সে যত বড় হচ্ছে ক্রমশ সে আমার পরম বন্ধু হচ্ছে। এর চাইতে আনন্দ-খুশি আর কিছু হতে পারে না। ওর দাদী সকালে চলে আসত সামায়েরার সাথে থাকত আর আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। তাই সন্ধ্যার পর আসতাম। ছোট তুলতুলে জীবন্ত একটা পুতুল কে কার কাছ থেকে কোলে নিবে কারাকাড়ি পরত। পোশিয়া সুখীর ননদ সোমা খুব মজা করত।

এখন পোশিয়া আবার বিয়ে করে এক সন্তানের মা। প্রথম দুই বছর পোশিয়ার বিয়ে ভেঙ্গে গেল। ভীষণ কষ্ট পেলাম এত সুন্দর ও লক্ষ্মী একটা মেয়ের ভাগ্যে কেন এটা হল। ওকে আমার আর একটা মেয়েই অনুভব করি। ওর বিয়েতে অনেকেই ভাবত আমি ওর মা যেভাবে আমরা সব মায়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতাম। নিজেকে কখনও মেহমান ভাবতে পারতাম না। আমার বেয়াই সৈয়দ লুৎফে আলী BTV Chief Engineer আনিজ House Wife দু'জনে খুব ভাল মানুষ।



সুখী ও পাঙ্কু মা হওয়ার সুখবরে আনন্দমুহুর্তে

২০১০ সালে সোমাকে অস্ট্রেলিয়া এমএস করতে সব জোগাড়ও করল

আমার আমি / ৪৮

শুধু অর্থের জোগান আমি দিলাম। Monash Universityতে M.S করে Bangladesh-এ ফিরে এসে NSUতেই শিক্ষকতায় যোগ দিল।



শুধু অর্থের জোগান আমি দিলাম। M.S করে Bangladesh-এ ফিরে এসে NSUতেই শিক্ষকতায় যোগ দিল।

আমরা ১১ জামাই নিয়ে মাসেই বলেছি তাদের প্রসঙ্গে কিছু লিখেছি। আমার ছোট নেরা ছোট মেয়ে ছিল আমার সবচাইতে বন্ধুত্ব। আমার বিয়ের সময় সিংহভাগ খরচ ও যোগানে দিয়েছে। এখন আমরা বারিধারায় পার্ক রোডে খুব কাছাকাছি থাকি। আমাদের ব্যবস্থানে ব্যস্ততায় আর ওর দীর্ঘ দিন বিদেশ থাকায় একটা আন্তরিকতার ফাঁক ঘুচল না। সেই বন্ধুত্ব আর আন্তরিকতা আর তেমন সাড়া জাগায় নাই। তবে ওর বৌ ডলি আমার খুব কাছের খুব ভাল ওর ছেলে, ছেলে বৌ, ও মেয়ে-জামাই সবাই ভাল।

এর পর মিহিরও বেশী সময় ৮-১০ বছর আমার সাথে সাথে বিভিন্ন স্টেশনে ছিল। ওর বিয়ে করা ব্যবস্থা সব কিছুতেই আমার সাধ্যমত সহযোগিতা ছিল। আমার স্বামীও ওকে ভীষণ ভালবাসে। কিন্তু ওর বিয়ের সময় সে থাকে নাই ছুটির অভাবে। ওর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ায় আমরা একেট কষ্ট পেয়েছিলাম। এর পর আবার নতুন বৌ আসল ২ বছর পর। এখন ওর মেয়ের বিয়ে হল কিছুদিন আগে। মেয়ে শার্লি মাস্টার্স করছে। ও যখন সপ্তম শ্রেণিতে তখন ওর মা মারা যায়। ভীষণ কষ্টের একটি সময়

আমার আমি / ৪৯



আমাদের সকলের ছিল। ছেলে জুনায়েদ এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। লীনা মা হিসাবে যথেষ্ট যত্নবান।

এর পর শাহীন আমেরিকাতে থাকে। ২ বছর পর একবার আমি যাই। ৭/৮ বার আমেরিকাতে আমি গিয়েছি। অনেক বেড়ান হয়। ওর স্বামী মুকুল খুব ভাল উদ্ভলোক। জীষণ কেয়ার নেয় আমার বোনের এবং আমরা গেলেও। ওর এক ছেলে ডিগ্গী পাশ করে বাংলাদেশে বর্তমানে আড়ং এর ম্যানেজার। খুব ট্যালেন্ট, ওর নাম সামু।

মিরান বোনদের মধ্যে ছোট আর খুব মিতুক ও অতিথি পরায়ন। খেতে ও খাওয়াতে পছন্দ করে। তার ব্যবসা বুটিকস। ওর স্বামী খোকন তার অন্তপ্রাণ হল মিরান। একটা ছেলে সোহান ডিগ্গী পাশ করে চাকুরী করছে। পরে এমবিএ করবে ওরা সকলেই আমার খুব আদরের।



মিডিয়ায় সামনে আমি

এর পর সবার ছোট ভাই ওর নাম তুরান। আমার বাবা যখন মারা যান তখন ওর বয়স মাত্র ১/২ বছর হবে। ওকে আমরা সবাই খুব আদরে মানুষ করার চেষ্টা করেছি। স্বাধীনতার পর স্কুল শেষ করে, কলেজ শেষ করে বেলজিয়ামে পড়ার জন্য গেল। ১৯৮৫ সালে তখন আমরা রাজশাহী বদলী হয়েছি। মিহির আমাদের সাথে কল্লবাজার-রাজশাহী দু'টোস্থানেই ছিল। তুরানের বৌ রিপা খুব ভাল মেয়ে। তাদের দুই ছেলে।

এর পরে আমার স্বামী বদলী হল। বিভিন্ন স্থানে আগেই বলেছি ১৯৯১ সালে ঢাকায় শাহীন স্কুলে ভর্তির পর আমার বড় মেয়ে সুমী ওখান থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি হলিক্রস তার পর নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্গী ও এমবিএ। সব যুদ্ধ বিশেষ করে ভর্তি যুদ্ধ এমন কি বিয়ের প্রায় সব কাজ আমি একাই করেছি। কারণ ও তখন বদলী হয়ে বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করছে।



নিউইয়র্ক

নেহালের ছেলে নিভেল।

বৌ মাহা ডাক্তার খুব ভাল। মেয়ে নাবিহা ডাক্তার। স্বামী সাফওয়ান প্রকৌশলী।

১৯৯১ সালে আমি কলেজের চাকুরীতে ঢুকে ২০১০ সালে অবসর নিলাম। একই সাথে সন্তান, সংসার, কলেজ এবং সামাজিক, কাব ও সংগঠন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বুঝতেই পারি নাই সেই দিনের ছোট সুলতানা বাল্য, কিশোর, যৌবন থেকে মধ্য বয়সে পরিণত হলাম।

আমার বর্তমানে নারী সংগঠন জন্টা ক্লাব ০১ এর প্রেসিডেন্ট, উত্তরা লেডিস কাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য। গত ২৫ বছর ধরে সাহিত্য সম্পাদিকা আরও কিছু সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যস্ততা। সংসার চালাতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত। অনেক পাওয়া, অনেক না পাওয়া, অনেক আনন্দ-খুশী, অনেক দুঃখ-হতাশা, অনেক ব্যর্থতা, অনেক অর্জন, ক্রেস্ট-সম্মান আবার অনেক অবহেলা। সবকিছু নিয়ে এই দীর্ঘ পথ চলা আমি এখনও চলছি। কখনও থমকে যাচ্ছি, হতবাক হচ্ছি। কিছু মানুষের আচার-আচরণে কষ্ট পাচ্ছি। অনেক স্বীমুখি মানুষের চেহারা চিনতে শিখেছি। ভাল নিঃস্বার্থ মানুষ যা পেয়েছি তার চেয়ে আপনজন স্বার্থপর মানুষের সন্ধান পেয়েছি অবাক হয়েছি ব্যথা পেয়েছি।

আমার সবচেয়ে আনন্দ হয় যখন আমি একমাত্র নাতনী সামায়েরার সাথে সময় কাটাই। ওর নিষ্পাপ ভালবাসা-আন্তরিক নানু ডাক আমার মনে



আবার আলো দেখায়। বেঁচে থাকার অর্থ বুঝায়। এখন একমাত্র আমার আনন্দ।

নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যখন সংগঠনের কাজগুলি ভালভাবে করে সদস্যদের কাছে সন্ধান পাই। অনেক ক্রেস্ট, মেডেল, পিন পেয়েছি। খারাপ লাগে যখন আপনজন মুখশের আড়ালে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানায়। কেমন যেন সকলেই কমবেশী স্বার্থপরতা আচরণ করে।



সিডনি, অস্ট্রেলিয়া

পাঞ্জু খুব ভদ্র-অমায়িক ছেলে। ওর সাথে কথা বা কোন বিষয় আলোচনা করে ভাল লাগে। সন্তান ছোট বেলায় যতটা কাছের থাকে ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনে আচার-আচরণ একটু বদলে যায়। তার পর আমার মেয়েরা-এটা-সেটা, শাড়ি ও জুতা, সেন্ট-লিপিষ্টিক, ব্যাগ উপহার দেয়। কিন্তু বুঝে না এর চাইতে বেশী দামী ওদের আন্তরিক-সঙ্গস্পর্শ। সময়ের আবর্তে সকলেই ব্যস্ত ছুটে চলছে, আমিও ছুটছি। বর্তমানে সকল সন্তান বাবা-মার জন্য সময় দিতে পারে না। নানাবিধ ব্যস্ততার জন্য এ চলার শেষ হবে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে। কিছুদিন মানুষের মুখে-হৃদয়ে অথবা অবসরে স্মৃতিতে ভাসমান থাকা যায়। এই ভাবে আদি অন্তকাল চলছে এবং চলবে।

তবে আমি এটুকু বলতে চাই আমি আমার পক্ষ থেকে কর্তব্যের কোন

অবহেলা করিনি বরং একটু বেশী করেছি। কিন্তু একটা সময় কোথায় যেন একটা রেশ কেটে জীবনটা বেসুরা হয়ে যায়। কথায় বলে-

“সংসার সুখের হয় রমণীর গুনে  
যদি থাকে গুণবান পতি তার সনে”



থাইল্যান্ডে বড় আপা ও আমি

সম্পর্ক রক্তের যতটা সত্য ও গাঢ়, ততটাই ফিকে অন্য সম্পর্ক। আত্মাহর কাছে প্রার্থনা করি সুস্থ্যসুন্দর মৃত্যু হোক প্রতিটি মানুষের আর বৃদ্ধা আশ্রমের প্রয়োজন না হয়ে প্রতিটি মানুষের প্রতিটি দিন হোক খুশি-আনন্দ এবং অর্জনের। আবারও হাবিবা আমার বন্ধু যার অতিরিক্ত ইচ্ছায় আমার লিখতে বসা। তাকে জানাই আন্তরিক ভালবাসা ও ধন্যবাদ।

আমার মা আমার আদর্শ। সবশেষে আমার মার কথা ও আমার অর্জন দিয়ে শেষ করতে চাই।

আমার মা ছিলেন ব্রিটিশ সময়ের গোল্ড মেডেল পাওয়া এনট্রাল পাস। খুব উদার ও আধুনিক মনের ছিলেন। আমরা ১১ ভাই-বোন। যার কাছে কখনও বকা বা মার খাইনি। অসম্ভব ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমতি ছিলেন। অতিথি পরায়ন এবং আমাদের বন্ধুর মত। বই-পত্রিকা (বেগম) ভীষণ আগ্রহ করে পড়তেন। আমি যখন থেকে টুকি-টাকি লেখা শুরু করি তখন থেকে মা



ছিলেন আমার পাশে ও সমালোচক। মা-বাবা আমরা কখনও বাগড়া বা উচুস্বরে কথা বলতে দেখিনি। বরং বাবা মাকে সব সময় বলতেন এই বড় সংসার সামলাতে হলে খাওয়া বিশ্রাম প্রয়োজন। সময় মত খেয়ে নিতে বলতেন। আমাদের প্রত্যেকের খাওয়ার কিছু মিল কিছু অমিল ছিল সেটা নানু ও মা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। মা বেড়াতে ও সিনেমা দেখতে খুব পছন্দ করতেন। আমাদের ছোট ৪/৫ টাকে নিয়ে বেড়ানো-সিনেমা উপভোগ করতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মা বদলে গেলেন। আর সিনেমা দেখতে যেতেন না। বোরখা পরতে লাগলেন, মা আপওয়া সদস্য ছিলেন। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর বাসায় তাবলীগ শুরু করলেন। হয়ত কষ্টটাকে ঢেকে রাখার জন্য। মার বাবা-মা অনেক ছোট বেলায় মারা যাওয়ার মামার কাছে মানুষ হয়েছেন। আমাদের মাত্র একটি মামা নাম আমীর আলী খান ও নানার নাম নবী নওয়াজ খান। তিনি জমিদার ছিলেন। মামা মাকে ও মাসি (খালা) ভীষণ ভালবাসতেন। তার ছেলে-মেয়ে ১৭ জন। তাদের বিয়ের পূর্বে তারিখ নিয়ে মার সাথে আগে আলোচনা করতেন অর্থাৎ মার সুবিধামত সময় অনুষ্ঠান হবে। মাকে ও আমাদের মাসিদের থাকতে হবে। একটা ঘটনা এখনও মনে পরে মামার বড় মেয়ের বিয়ে। আমরা



নায়মাহা ফলস-এ আমি ও আমার বোন শাহীন



আমাদের সারওয়ান ও সারওয়ানের সাথে মুকুল, শাহীন ও আমি।

আমাদের থেকে স্টীমারে উঠলাম। টিকিন ক্যারিয়ার বোঝাই খাবার। আমাদের প্রিয়ভর্ত। কারণ মাসিরা চাঁদপুর থেকে উঠবে। তিনিও খাবার নিয়ে আমাদের যে কি আনন্দ হত। বরিশাল পৌঁছে দেখতাম সব মানুষের হাতের পাইন দিয়ে সাজিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। বিয়ে বাড়ীতে যে কি মজা হত। সেই সব মানুষগুলো এখন বেশীর ভাগই নেই। মামা আমার মানিকগঞ্জ বাসায় বেড়ানোর পর মারা গেলেন। আদর করে মামাকে এত খাইয়ে ছিলাম কারণ মামা খেতে ও খাওয়াতে ভীষণ পছন্দ করতেন। পরে রাতে প্রেসার বেড়ে মামা অসুস্থ। মাকে ফোন করে কি করব জেনে নিয়ে আমি ও আমার স্বামী নতুন বেশ আনারি। যা হোক সারা রাত মার পরামর্শ অনুযায়ী মাথায় পানি-তেল মেখে বাতাস করে কিছুটা সুস্থ্য করে সকালে মার কাছে ঢাকায় পৌঁছে ছিলাম। এর কয়েক মাস পরেই মামা মারা যান। কত সুন্দর স্মৃতি মামার সাথে। আমার মামা ছিলেন ৭ ফিট পাঠানদের মতন স্বাস্থ্য। বরিশালে আমরা পৌঁছে গেলেই আমাদের দল বেঁধে নিয়ে বাজারে যেতেন কার কি লাগবে। সেই মধুর স্মৃতি এখনও আমাকে উদাস করে দেয়। মাকে আমরা মাদার তেরেসা ডাকতাম। ১৯৯৭ সালে ২৫ নভেম্বর মা আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে বাবার কাছে



প্রায় ৩০ বছর পর চলে গেলেন। হারানোর ব্যাথা সেই বুঝবে যারা মা হারিয়েছে। তখন মার বয়স ৮০ বছর ছিল আর আমরা ভাবতাম ৬০ বছর সন্তানের কাছে মার বয়স বাড়বে না। কারণ আমার মেয়েরা অনেক সময় ওদের মত সাজগোছ করতে বলে। বোঝেনা বয়সের ব্যবধান।

আমার অর্জন বলতে অনেক। প্রথমত দুটি সুন্দর, সুশিক্ষিত মেয়ে। মা হওয়া গৌরব অর্জন করেছে। ১৫ বছর প্রথম জীবনে বাইরে কোন কাজ না করে ওদের পেছনে সময় দিয়েছি এবং বড় মেয়ে রেজয়ানা সুখী, বিবিএ, এমবিএ, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ব্যবসা (গার্মেন্টস) করে। আল্লাহর রহমতে স্বামী ও একটি কন্যা সন্তান নিয়ে সুখে আছে। ছোট মেয়ে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ করে Australia, Melborn, Monach Universityতে MS করেছে এবং বর্তমানে NSU (Marketing Dept.) Junior Lecturer।



শাহীন ও আমি ফিল্যাডেলফিয়া, আমেরিকা

সামায়েরা: এবার চতুর্থ প্রজন্ম আমার একমাত্র নাতনী সামায়েরার কথা। মানুষ যখন নাতনীর গল্প বলে আনন্দ অনুভব করত তখন আমি ভাবতাম এত আনন্দের কি আছে। অনেক সময় বাড়াবাড়ি মনে হত। মা না হলে যেমন মায়ের মর্যাদা অনুভব করা যায় না, তেমনি নাতি-নাতনী না

আমার আমি / ৫৬

হলে ভালবাসা গভীরতা অনুভব করা যায় না। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস আমার জ্ঞান এই সামায়েরা। ওর সম্পর্ক, উপস্থিতি, কথা সব মিলিয়ে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। প্রায় ৬ বছর চলছে ওর সাথে কথা বলে যে আনন্দ ও শক্তি সঞ্চয় হয় তা বলে বুঝান যাবে না। আল্লাহর কাছে শোকরিয়া এই Precious gift দেওয়ার জন্য, সে আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিজের সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধের গল্প, ভাষা আন্দোলনের গল্প শোনানো, কথা মাথায় আসেনি। কিন্তু ওর সাথে হচ্ছে সেই সব সত্যি ঘটনা যা সত্য। বিশেষ করে '৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধ যার স্বাক্ষর আমার সেই গল্প। মন দিয়ে শোনে দেশকে সে ভালবাসে এবং আমাদের কেও ভালবাসে। প্রশ্ন করে জেনে নেয় সত্যি ঘটনা কি। আমি তাদের চেহারা Computer-এ দেখাই। আল্লাহ আমাদের দুই জীবন দিক সু-শিক্ষা, স্ব-শিক্ষা নিজের মর্যাদা রেখে দেশ সেবা করে জীবন সুখী ও স্বার্থক করুক এই দোয়া থাকল। সেটা একটা বড়



নাতনী সামায়েরা ও আমি

অর্জন। আমার কর্ম জীবনের অনার্স ডিপার্টমেন্ট (Home Economics) চেয়ারম্যান হয়ে বিদায় নিয়েছি খুব সুন্দরভাবে। বড় অর্জন আমার টিচার হিসাবে প্রধানত ২য় ব্যাচ নুসরাত নাতু অনার্স ও মাস্টার্স গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছে। তার সাথে ৭তম ও ১১তম হয়েছে আরও দুটি

আমার আমি / ৫৭



ছাত্রী। সেদিন যে কি আনন্দ লেগেছে। কলেজ থেকে বিশাল সম্বর্ধনা দিলাম। আমাকে অনেক সেদিন ভাবিয়েছিল আমি বোধ হয় ওর মা। এই স্মৃতি চির অম্লান থাকবে। এখনও নাতু, লীমার সাথে যোগাযোগ আছে। আমার কলিগ সকলের ভালবাসা সিক্ত বিদায় হীরের আংটির মধ্য দিয়ে এবং প্রিন্সিপ্যাল স্যার গাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে নিমন্ত্রণ দিয়ে দিলেন কলেজের সব অনুষ্ঠানের জন্য। এটা আমার জন্য পদম পাওয়া। কথায় আছে শেষ ভাল যার সব ভাল তার। আমি কলেজ থেকে পাওয়া টাকায় কলেজে জেনারেটর দিলাম বিদায় শুভেচ্ছা স্বরূপ। জিন্নাত, চাঁদ, শিল্পী ওরা ছিল আমার ছোট বোন। আমার গার্হস্থ্য বিভাগ। এখন ওরা আমাকে ঈদে উপহার পাঠায় আমিও পাঠাই। প্রায় সব বিভাগে আমার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ফারহাত, নাজমুন, লাভলী আপা, আইভি, রুকসানা, আঙ্গুরা, জাহাঙ্গীর স্যার, বাতেন স্যার, হাফিজুর রহমান, দিলীপ, আনোয়ার স্যার, আজ প্রায়ই সব শিক্ষক আমাকে এখনও গেলে অনেক সম্মান করে। অফিসে সব এমনকি গেটের রুহুল, মুন্না ও শেফালি যথেষ্ট সন্মান করে। বিদায়ের পর অনুষ্ঠান কলিগদের সন্তানের বিয়ে প্রায় সব অনুষ্ঠানে আমি মিলিয়ে পেয়ে থাকি এবং এখনও পাই। আমি আশ্রয় ভরে উপস্থিত হই।



সামায়েরা ও আমি



সামায়েরা ও তার বন্ধু ইয়াশমিনা

আমার এরা বেনী পাওয়ার কথা নয়। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমার বোন থাকে। আর যা পাইনি তার জন্য কোন আফসোস নেই। আমি বেনী ভ্রমণ করেছি, স্বামীর সাথে ২/৩ টা ছাড়া আমি বেশীর ভাগে একা ঘুরেছি। আল্লাহ এই বয়সে যথেষ্ট ভাল রেখেছেন। মৃত্যু হোক ঈমানে আর যে কয়দিন বাঁচি সে কয়দিন যেন ইজ্জতসহ, সম্মানসহ বাঁচি। আমি কোন নামি-দামি লেখিকা নই। মনের আবেগ, ভাললাগা ও কষ্টলাগা ছোট বেলা থেকে এই মধ্য বয়সের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। কিছু সংগঠনের কথা না বললেই নয়। কারণ এই সংগঠন (সামাজিক) টিভি ও রেডিও প্রোগ্রাম করে। আমার মতন খুব সাধারণ মেয়ে থেকে প্রত্যয় মহিলা হতে পারতাম না। কাজ মানুষকে শক্তিশালী আত্মপ্রত্যয় ও সাহসী করে তুলতে সাহায্য করে। আমি যদি শুধু মিয়া মোহাম্মদ ইদ্রিস এর বৌ অথবা মরহুম নাজিমুদ্দিন শরিফুনেনসার মেয়ে হয়ে দুই কন্যার মা হয়ে সাধারণ ঘর গৃহস্থলি নিয়ে পরিচয় গণ্ডিতে ঘুরপাক খেতাম। মূল্যবান সামাজিক ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হতে পারতাম না। উত্তরা লেডিজ ক্লাবের সভাপতি জাহানারা ইসলাম তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিপি। যার ভাই বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর



রহমান, বোন অধ্যাপক জামিলা আজাদ। ড. আলাউদ্দিন-আল-আজাদ। যার স্বামী, এদের মতন বড় মাপের মানুষদের সাথে পরিচয় হত না আশীর্বাদ পেতাম না।

লেখা শেষ করাও এক জটিল কাজ। বার বার মনে হয় কি যেন লেখার ছিল, কাকে মনে করা হয়নি। তাই আবার একটু না লিখলেই নয়। তা'হল জন্টা ক্লাব-এর President হয়ে অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে যাদের কথা না লিখলেই নয়।



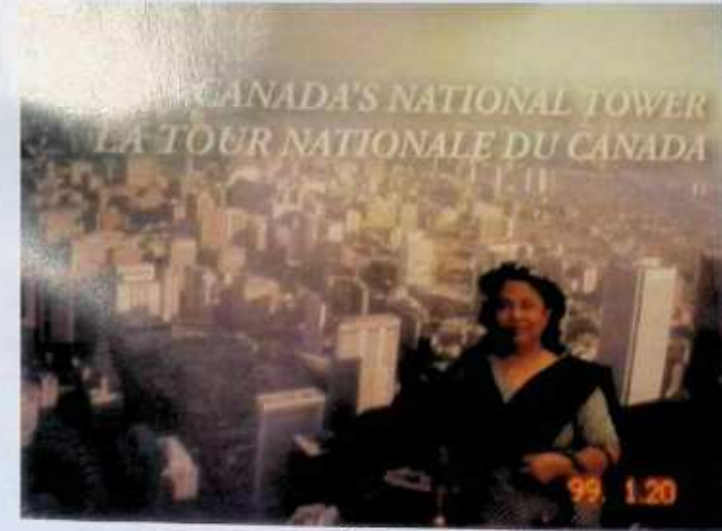
লন্ডন-ইংল্যান্ড

হাসনা মওদুদ, নাসরীন আপা যাদের সাথে পরিচয় না হলে হয়ত আমার Zonta Club-01 President হওয়া হত কিনা সন্দেহ। এক রকম জোর করে বিশেষ করে নাসরীন আপা ২০১২ সালে আমাকে সেক্রেটারির জন্য মনোনয়ন করলেন এবং অনেক দ্বিধা পেরিয়ে হাত ভোট জিতে গেলাম। এরপর শুরু হল হাসনা আপা প্রেসিডেন্ট কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তিনি দেশের বাইরে থাকায় আমাকে President-এর দায়িত্ব পালন করতে হত। এভাবে দু'টি বছর বিভিন্ন জন্টা বিশেষ করে সাররক আপা, জায়েদা আপা ও হাসনা আপা (Email-এর মাধ্যমে) সমস্যার সমাধান সাহায্য করতেন। হাসনা আপার বড় গুণ উনি যখন দেশে থাকতেন তখন বাটপট

আমার আমি / ৬০

কিছু কাজ করে ফেলতেন আর আমি যা করতে চাইতাম তাতে সমর্থন দিতেন। এর পর আবার ভোট। এবার ২০১৪-২০১৬ President পদপ্রার্থী এবং নিরঙ্কুশ ভোটে পাশ করলাম মাত্র ২৪ সদস্য নিয়ে আজ তা ৩৭ দাঁড়িয়েছে। কোন সংঘটন একাকি প্রচেষ্টায় এগিয়ে যায় না। বেশ কিছু Young সদস্য হাসি-আনন্দ নিয়ে এগিয়ে এসে আমার হাত কে জোড়াল করল। নাজমা আপা, তাহমিনা আপা, ফারহান, মায়া, মেরী, কান্তা বুমু, হেলেন, আমরা, কাকলি। কান্তা-একটি মিষ্টি-শান্ত মেয়ে। সব সময় হাসিখুশি ও হল রেকর্ড সেক্রেটারি। যত SMS দেওয়া করা ও ছিল পারদর্শী এবং একনিষ্ঠ, ওকে কাজ দিলে আমার চিন্তা থাকে না। কাকলী ও SMS দেওয়া সাহায্য করে।

জন্টা ক্লাব সেক্রেটারি নির্বাচন আমি আগে থেকেই চোখে রেখে রাখতাম। জীবন গুণী মেয়ে, একধারে গায়িকা, ডাক্তার আবার Active Social Worker, মুখে হাসি লেগেই থাকে। ৩টা ক্লিনিক, বাসা, বিশাল জগতকে সামাল দিয়ে সুস্থ্য থাকা সত্যি টিভিতে একত্রে কয়েকটি অনুষ্ঠান করেছে। আগামী জন্টা ক্লাব হওয়ার কথা। ওর জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা।



কানাডা সিএন টাওয়ার

আমার আমি / ৬১



হেলেনা: নামটা শুধু সোনা ছিল, কারণ ও একবার AIDS Patient দের Washing Machine দিয়েছিল। হঠাৎ Women's Enterpreur Day Rally তে চাকুস দেখা, কাকলী নিয়ে আসছিল। সেই পরিচয় এর পর বিগত প্রায় ২ বছর ধরে ওর সাথে এত কাজ এবং এত অনুষ্ঠানে গিয়েছি আমি অবাক ওর কাজের পরিধি দেখে এই অল্প বয়স সে ৪টা গারমেন্টস একক ভিত্তি



টুইন টাওয়ার

২২/২০ ক্রাবের মেম্বার, ডোনার, পেট্রোন, সারাদিন ছুটে চলা। নিজের অর্থে অভাবী-অসহায় মানুষের সেবায় জায়মাত্র ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, আমাকে ভীষণ সন্মান করে। আমি ওর চমৎকার হাসি খুশী আচরণ, সামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সাহায্য কার্যকলাপের পাশে থাকি। আমাকেও প্রায় সর্বত্র যেটা আমার অঙ্গন নয়, সেখানে সম্মানসহ করে নিয়ে যায়। কারণ কাজগুলি সব প্রত্যন্ত এলাকায় নারী শিশু অসহায় মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য-বস্ত্র, সংক্রান্ত। ১৪ বছরে বিয়ে হয়েছে আর ৩ সন্তানের জননী (৩৮-৪০) বছর বয়সে যে কাজ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, ভাবলে শিহরিত হয়ে উঠি। ওর স্বামী জাহাঙ্গির সাহেব ভীষণ ভাল মানুষ এবং সহযোগীতা সম্পন্ন, হেলেনার অদম্য কাজের স্পৃহা, সাহস, শক্তি, বিস্তার আর স্বামী- সন্তান সহযোগীতা ছুটে চলছে এই প্রজন্মের মাদারতেসা আলোকিত Sister Helena. ওর সাথে

উপদেষ্টা পদ দিয়ে ও যে সম্মান দিয়েছে আমি সেই সম্মান কাজের মাধ্যমে ধরে রাখতে চাই। সব সময় বর্নার ধারা হাসি বুঝিয়ে দেয় ওর উদ্যমতা ও কর্মক্ষমতা দোয়া করি দীর্ঘ জীবন সমাজের জন্য হেলেনার মত কর্ম উৎসাহী, বুদ্ধিদীপ্ত সম্পন্ন নারী হাল ধরে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে পূর্ণতা দিক। আমার সর্বান্ন দোয়া ওর চলার পথে রইল। সুস্থ ও সুন্দর জীবন হোক।

আর একটা নাম না লিখলেই নয়, সে নামটি হলো অনামিকা আমার মেয়েরই মতো। আমরা একই বিন্দিং-এ গত ১০ বছর ধরে এক সংগেই আছি। সে খুবই ভাল একটা মেয়ে। সে আমার সময়-অসময়, সুখে-দুঃখে খোজ-খবর রাখে। তার প্রতি রইল আদর ও দোয়া। এছাড়া সুলতানা, রোকসানা কাকলী, শাহীনা, শামীমা, শিলা, রাইয়ানা আরও অনেক যা আমার মনের কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। মজার ঘটনা এরা বয়সে প্রায় সব আমার বড় কন্যার বয়সী দু/একজন কিছু বড় কিন্তু সকলে আমার বন্ধু এবং একান্ত কাছের।



জাতিসংঘ

উত্তরা ক্রাবের আমার ২৫ বছরপূর্তী সব আপন বোন মত যেমন, রোকসানা, ইসমে আরা, শাহীন ফারুক, সুরাইয়া ভাবী, রাজী, খালেদা, সেলিনা, জাহানারা আপা মায়ের মতন ওনার অসম্ভব দক্ষতা, শ্রদ্ধা জানাই সম্মান করি। জমিলা আপা অসম বয়সী বন্ধুত্ব আনন্দ দেয়।



কলেজের সকলেই আসলে আমার এত কাছের কার নাম লিখব-  
জিন্নাত, চাঁদ, শিল্পি, ফারহাদ, লাভলী আপা, রোকসানা, আইভি, ফেরদৌস,  
নাসরিন, জাহাঙ্গীর স্যার, বাতেন স্যার, হাফিজুর রহমান, মনোয়ার  
প্রিন্সিপাল স্যার, অফিসের সকল স্টাফ এর জন্য রইল আমার প্রাণঢালা  
ভালবাসা ও শ্রদ্ধা।



জিং জাং, চায়না

এছাড়া IEB ইঞ্জিনিয়ার মহিলা কমিটি আমার অন্য একটি ভূবন।  
সেখানে অনেকে এত কাছের মনে হয় না ওরা আমার আপন ভাবী না বা  
বোন বন্ধু নয় আসলে সময় আন্তরিকতা মানুষ মানুষের কাছের মানুষ হয়ে  
যায়। রুবী ভাবী ভীষণ ভাল একজন দক্ষ মহিলা ছিলেন, কিন্তু অদক্ষ কিছু  
মানুষের প্ররোচনায় তিনি আর আসেন না। নীপা, বিলকিস, মেরী, মায়্যা,  
ময়না, সুচরিতা, চায়না কখন যে আপনি থেকে তুই এ সম্বোধন হয়ে গেল  
আমরা জানিনা, সকলের জন্য শুভেচ্ছা। লিলি ভাবী, নাসিম ভাবী, হোসনে  
আরা আজাদ, মাহতাব আরা হাকিম, এমি ভাবী সকলের সাথে আমার  
চমৎকার সম্পর্ক। কত নাটক, অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং র‍্যাফেল ড্র করেছি,  
সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছি পুরস্কার পেয়েছি তাই আমার কোন  
আফসোস নেই।

এক জীবনে মানুষ যা পায় তার চাইতে অধিক পেয়েছি দেশ-বিদেশে।  
বিদেশে আমার ছোট বোনের বন্ধু সব আমাকে এত ভালবাসে মনেই হয় না  
ওরা আমার রক্তের সম্পর্ক নয়। সালমা, সারওয়ার, লিনা, ইলা, মুনমুন,  
তাসলিমার মা, নাসিমা আরও অনেক ওরা যে কি সম্মান করে তা বলে  
বুঝানো যাবে না। আমেরিকা গেলে ওদের বাসায় বেড়াতে হয়। শাহীনের  
ডাকা মেয়েদের বাসায় বেড়াতে যাই কারণ ভাল লাগে।



পুরস্কার গ্রহণ করছি

জন্টা ক্লাবের সব তুখোর সাফল্য ব্যবসায়ী নারীদের কথা জানতেই  
পারতাম না। কবি জসিমউদ্দিনের কন্যা আমার আগের প্রেসিডেন্ট হাসনা  
মওদুদকে এত কাছে থেকে জানতে পারতাম না। তিনি যে বহু গুণে  
গুণাবিত্ত কবি। ধৈর্য্য কাকে বলে তিনি এখনও বোস্টন ইউনিভার্সিটিতে  
সিক্স রোড নিয়ে গবেষণা করেন। নাসরিন আওয়ালের মত সাফল্য  
ব্যবসায়ী পেতাম না। বর্তমান প্রজন্ম সাফল্য ব্যবসায়ী হেলেনার সাফল্যের  
কথা জানতে পারতাম না। ড. রুম্ম খান-এর মত বিদূষী শাস্ত্র সাফল্য  
একাধারে ডাক্তার, গায়িকা, কলামিস্ট, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব সাথে বর্তমানে কাজ  
করার সুযোগ হত না। এটিএন বাংলার ডাইরেক্টর কাকলীর সাথে তার  
কাজের সংগ্রাম এর কথা এবং টিভি প্রোগ্রাম করতে পারতাম না। এ ছাড়া



আমরা কবির (ডলি), কান্তা কাকলি, মায়া, ফারজানা, নাজমা হুদা আপা তাদের ভালবাসা কাজের সহযোগিতা পেতাম না হেলেনার মত...। আমার জীবনের ২৩ বছর শিক্ষকতা করে ঢাকা উইমেন কলেজে কাটলাম। সেখানকার প্রিন্সিপাল তৌফিকা মাহমুদ যাকে আমরা আয়রণ লেডী হিসাবে দেখেছি। তার অভিধানে কোন 'না' শব্দ নেই। অত্যন্ত সাহসী নারী বহুগুণে গুণাবিত ছিলেন। একবার যে কান্ড হল-আমাদের কলেজের তখনও সরকারি MPO ভুক্ত হয়নি। ঐ দিন ছিল শেষ তারিখ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ধানাই পানাই করছিল ঘুম নামক ব্যাপারে।

অর্থাৎ না দিলে আবার ১ বছর পিড়িয়ে যাব। আপার সাহসী কণ্ঠস্বর লোককে বলছিলেন, "আপনি যদি ফাইল সাইন না করান তা হলে আপনাকে ৪তলা থেকে নীচে ফেলে দিব"। তার চিৎকার শুনে পানি মন্ত্রী মরহুম রাজ্জাক সাহেব বের হয়ে এসে সমস্যার সমাধান করলেন। বিভিন্ন কলেজের পুরুষ প্রিন্সিপাল এসে আপাকে সালাম জানাল। এই ছিল তখন সত্যের জন্য লড়াই। আরও অনেক ঘটনা যা সব তুলে ধরতে পারবো না। সেই কলেজ আজ ইউনিভার্সিটি হয়েছে। তার স্বপ্ন সফল হয়েছে। আরে আত্মা শান্তি হোক।



হোম ইকোনোমিক্স কলেজ সম্মেলন (হিহাব)

আমার শেষ ইচ্ছা আমার অবসর ভাতার টাকা থেকে মা-বাবার নামে আমাদের কলেজ বৃত্তি প্রদান করব। মা-বাবার স্বপ্ন শোধ করা যায় না। তাদের স্মরণীয় করে রাখার প্রয়াস যতদিন বেঁচে থাকার মানুষ, যাতে ভালবাসে এবং মরে গেলেও যেন এই টুকু বলে মানুষটা খারাপ ছিল না। আগামী প্রজন্মের জন্য রইল আমার প্রাণঢালা ভালবাসা, দোয়া, সুন্দর, সুষ্ঠু হোক ওদের জীবন। প্রতিটি সন্তান থাকুক দুধে-ভাতে আর মা-বাবা থাকুক সন্মান ও শান্তিতে।

ভাল-মন্দ একে অপরের পরিপূরক। আজ যা ভাল মনে হয় আগামীকাল তা খারাপ অথবা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। জীবনের অনেক সুন্দর-খালস স্মৃতি মানুষ ভুলে না। বার বার মনে হয় সেই বাল্যকাল-কলেজের বার ফিরে আসতো। হাজার চেষ্টা করলেও মানুষ ফেলে আসা কিছু ফিরে আসবে না। মানুষ এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই সেই চেষ্টা না করা ভাল। ফিরে আসে না ফেলে আসা দিনগুলো। মানুষ অতীত থেকে শিক্ষা নেয় বর্তমানকে সজাগ থাকিয়ে ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তুলে। সেই শিক্ষা-অভিযান চেষ্টা-নিয়ম ও আইন করা হয়। শিক্ষা-অভিযান ও পরিবর্তন হয় মানুষের জন্য। তাই আমার চিন্তা-অভিযান-পরিবর্তন বা থাকুক বা অপ্রয়োজনীয় তাই ফেলে সকলে এগিয়ে যাক। সুখ-স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি মানুষের মনে স্থান পায় শুধু কল্যাণকর কর্ম। সেখানে আর কিসের স্মৃতি থাকবে। এতটুকু ভাল কাজ করে থাকি তাই হোক আমার



সোমা ও সুবী  
আমার আমি / ৬৭



মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা সব কিছু তুলে ধরা সম্ভব নয়, মধ্য বয়সে এসে স্মৃতি রোমন্থন করে কিছু তুলে ধরলাম। হয়ত অনেকের কথা লিখতে পারিনি সে আমার অক্ষমতা, চেষ্টা করেছি বাল্যকাল থেকে মধ্যাহ্নে এসে যা মনে রেখেছি তা লিখতে, এর ভিতর আত্মীয়, বন্ধু অনেক



সুখীর জন্মদিনে দুই বোন

হারিয়েছি-সাদেক, জাহানারা, মাজেদা, সুইটি, শেলি, বুলবুল তাদের আত্মার শান্তি হোক ওরা সব আমার বন্ধু। গুরুজন বাবা-মা, মামা, খালা, খালু, চচা-চাচি, ফুপা-ফুপু, আমার মেজ ভাই এবং মেজদুলাভাই, রাহিমা আপা, নিরু বুয়া, মিষ্টি খালা, দিদি আরও অনেকে হারিয়েছি। তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। সবশেষে আমার গৃহকর্মী সীমা ও কল্লনা গত ১০ বছর ধরে অক্লান্ত সেবা দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ওদের সুন্দর জীবন দিক এবং ওদের জন্য রইল দোয়া।

“জন্ম হোক যথা তথা  
কর্ম হোক সুন্দর”



আমাদের ২৫তম বিবাহ বার্ষিকী



জর্জ লেক, আমেরিকা



একটি আনন্দঘণ মুহূর্ত



শিলাইদহ কুটিবাড়ি, কুমারখালী, কুষ্টিয়া



আমাদের সুখী পরিবার



সুখী, পাঙ্ক ও সামায়েরা





সুখীর স্বাদ-বেরাইন ও সুখী ও আমি



সিলেট ভ্রমণ



সেই রাতে কন্যা রাখছেন হোননে আরা ইদ্রিস



স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন-এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন



ইন্টারন্যাশনাল ডে-২০০৬ এর এক আনন্দঘন মুহুর্তে আমি ও আমার বন্ধুরা



প্রথম ও প্রথম পুরস্কার



নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সমাবেশে অনুষ্ঠানে আমার বড় মেয়ে সুখী ও তার স্বপ্ন-শাওড়ী



লায়ন্স পুরস্কার গ্রহণ করছি





বিবি রাসেল ও আমি



হাবিবা ও আমি

আমার আমি / ৭৬



অস্ট্রেলিয়া



আমার কন্যা সোমা, সুখী ও নাতনী সামায়েরা

আমার আমি / ৭৭



সাময়েরা ও তার বন্ধুরা



উত্তরা ক্লাবের ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পুরস্কার গ্রহণ বিশেষ এক মুহূর্ত



জাহাঙ্গীর, মিলেট



গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী-২০১১ এর এক অনুষ্ঠানে চাঁদ, জান্নাত ও আমি





বড় আগার ৫০তম বিবাহ বার্ষিকীতে আমরা



অনন্দের মুহূর্ত আমরা



অধ্যাপিকা হোসেনে আরা ইলিস ১৯৭৪ সনের ১ জানুয়ারি বরিশালের পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে ঢাকায় অবস্থান করেন। বাবা সরকারি অফিসার ছিলেন মরহুম নজিমুদ্দিন, মা মরহুম শরিফুন নেসা ছিল শিক্ষিকা, সমাজ সেবিকা (আপওয়া)।

ঢাকায় সেখাপড়া, শৈশব ফরিদাবাদ জ্বলের পর মনিজার রহমান পার্বসি স্কুল, গেভারিয়ায়। হোম ইকোনোমিক্স কলেজ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করে ঢাকা উইমেন্স কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৯১ সন থেকে ২০১০ পর্যন্ত বিজ্ঞানীয় গ্রামার ও চেয়ারম্যান হিসেবে অধঃপর গ্রহণ করেন। শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সনে সেণ্ট্রাল পার্বসি স্কুল। মাঝে বনানী বিন্যাসিকেরতম বছর খানেক শিক্ষকতা করেন।

বাল্যকাল থেকে রেডক্রসের মধ্য দিয়ে মানব সমাজ সংগঠনের কাজ শুরু করেন। বর্তমানে উত্তরা সেন্ট্রাল ক্লাব-এর সাহিত্য সম্পাদিকা (১৯৯১-২০১৬)। জাতী ক্লাব ঢাকা-০১-এর প্রেসিডেন্ট, ICR সক্রিয় মেম্বর, ইউনিভার্সিটি সিকিউটি-এর আজীবন ভেটোর, ল্যান্স ক্লাব ০১৫-এর আজীবন সদস্য ও পেন্ট্রন, বারিধারা সোসাইটির সদস্য। হোম ইকোনোমিক্স কলেজ এসোসিয়েশনের সদস্য, জয় যাত্রা ফাউন্ডেশনের উপপেট্রা এবং নারী সংগঠন এর সদস্য।

এছাড়াও বিভিন্ন মিডিয়া ও বেতারে টকশো-নারী বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক, পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছে। যেমন- অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া, ইজাম্বুল, টান, হংকং, মস্কো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, কানাডা মোটামুটি পুরো বাংলাদেশ। তিনি অনেক সংস্থা থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন।

বর্তমানে অটিস্টিক বাচ্চা নারী ও শিশু নির্বাহন বজ্ঞর এবং অসহায় নারী-শিশুর উপর কাজ করছেন।

জামদানী পাড়া, ঝগগড়, নারী তাঁতী সৃষ্টির উদ্যোগের কাজ করছেন এবং বর্তমানে বয়স্ক নারী শিক্ষার উপরে কাজ করে চলেছেন। তিনি সকলের সাহায্য ও নোয়া কামনা করছেন।